টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য

'বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই তৃতীয়াংশ এই বইখানি (টডের রাজস্থান) হইতে গৃহীত।"

স্বামী বিবেকানন্দ

টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ

১লা বৈশাখ, ১৩৫৭

Toder Rajasthan

O

Bangla `ahitya

[Impact of Tod's Rajasthan on Bengali Literature]

by Dr. Barun Kumar Chakrabarty, M. A., Ph. D.

প্রচ্ছদ ঃ

প্রবীর সেন

বাইশ টাকা

'সায়নে'র পক্ষে শ্রীঅমলকুমার সাহা কর্তৃক ১১৬, কার্ল মার্কস সরণী, কলিকাতা-৭০০০২৩ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ কর্তৃক নিউ কমলা প্রেস, ৫৭।২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

বুলবুলকে

দিলাম।

এই লেখকের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ :

সাহিত্য সমীক্ষা

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস

বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল পাত্র

লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ

বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গেতর ভারত (যন্ত্রস্থ)

নিবেদন

কর্ণেল টড বিরচিত মূল্যবান 'রাজস্থান' গ্রন্থটি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সব ক'টি বিভাগেই যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, এই সম্পর্কে বর্তমান লেখকের প্রথম যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি প্রয়াত অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। মূলতঃ তাঁরই প্রেরণায় দীর্ঘ দেড় দশকেরও আগে এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করি। তারপর দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের ফলে যে বিপুল পরিমাণ তথ্যাদি এই সম্পর্কে সংগৃহীত হয়েছে, তার সীমিত অংশ অবলম্বনেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত। বলাবাহুল্য, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়েই সীমিত পরিসরে বর্তমান আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে অনেকেই উৎসাহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই পরম পূজনীয় আচার্য সুকুমার সেনের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। তিনি গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেছেন। আমার পূজনীয় জ্যাঠামশাই স্বনামধন্য অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার প্রতিটি গ্রন্থ রচনার ব্যাপারেই সস্নেহ উপদেশ দান করে আমার প্রতি তাঁর অকৃপণ স্নেহের পরিচয় দেন। এই গ্রন্থটির বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাছাড়া আমার অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে যে আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছেন, সেজন্য আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক ডঃ অরুণ বসুও গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সযত্নে পাঠ করে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে বর্তমান লেখককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক সহায়তা ব্যতিরেকে বর্তমান গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর হ'ত না। অধ্যাপক দিলীপকুমার ঘোষ গ্রন্থটি প্রকাশে যেভাবে আগ্রহ দেখিয়েছেন, সেজন্য তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটির মুদ্রণ এবং প্রকাশের জন্যে শ্রীমান অনুপকুমার মাহিন্দার ও শ্রীমান্ অমল সাহাকে সাধুবাদ জানাই। গ্রন্থটির নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন স্নেহভাজন মহম্মদ সাহাবুদ্দিন। তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

বর্তমান গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'উদ্বোধন', 'বৈতানিক', 'ঐকতান', 'চতুষ্কোণ', 'লোকসেবক', 'শিবম্' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১লা বৈশাখ/

বরুণকুমার চক্রবর্তী

বিষয়সূচী : **পৃষ্ঠা :**

প্রথম অধ্যায়

বাঙালীর ইতিহাস চর্চা ; টডের জীবনকথা ও 'রাজস্থান' গ্রন্থের গুরুত্ব

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং সভ্যতার অধিকারী! কিন্তু উল্লেখযোগ্য হ'ল এই যে আমাদের দেশের ইতিহাস রচনার বহুবিধ উপকরণ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন ইতিহাস রচিত হয়নি। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন ইত্যাদি অনুশীলনে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবাসী অগ্রসর, কিন্তু সব মিলিয়ে দেশের একটা সামগ্রিক পরিচয় জ্ঞাপক ইতিহাস রচনার প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরেই অনুপস্থিত দেখা গেছে। অবশ্য কোন কোন রাজা—রাজড়ার সভাসদ্ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ঐতিহাসিক রচনা রেখে গেছেন, তবে তা নিতান্তই সীমিত প্রয়াসমাত্র। বিশেষ বিশেষ রাজা বা সম্রাটের চরিত্র মাহাত্ম্য কীর্তন এবং আনুষঙ্গিকভাবে সমসাময়িক সমাজ জীবনের কিছু কিছু পরিচয় এইসব রচনায় বিধৃত হতে দেখা গেছে। এইরকম রচনার কয়েকটি নিদর্শন হ'ল ৭ম শতাব্দীর কবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত', কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' (১০৭০ শকাব্দে শুরু এবং গ্রন্থটির রচনা সম্পূর্ণ হয় পরের বছর), খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে আবির্ভূত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্', আনুমানিক ৮ম শতকের আদিভাগে আবির্ভূত দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতম্', খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কচরিত', আবুল ফজলের (১৫০১—১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ) 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী', আবদুল কাদের বদায়ুনীর (১৫৪০—১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) 'তারিখ-ই-বাদায়ুনি', হাশেম আলি খাঁর 'মুন্তখা-অললুবার' ইত্যাদি। এইসব রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাই থাক, তবে এগুলির সব থেকে বড় ত্রুটি হ'ল নিরপেক্ষতার অভাব। অথচ নিরপেক্ষতাই হ'ল ঐতিহাসিক রচনার প্রধানতম গুণ। এখন প্রশ্ন হ'ল এই শ্রেণীর রচনাগুলির নিরপেক্ষতার অভাব কেন ঘটেছে?

প্রথমত, যাঁদের নিয়ে এই সব গ্রন্থ রচিত, রচয়িতারা ছিলেন তাঁদেরই প্রসাদ পুষ্ট, অনুগৃহীত। তাই স্বভাবতঃই এঁদের রচনায় নিরপেক্ষতা গুণ রক্ষিত হয়নি, পোষ্টাদের ত্রুটি রচয়িতাদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে গেছে। নতুবা ত্রুটিগুলি চোখে পড়লেও ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা তা এড়িয়ে গেছেন। কেউই পৃষ্ঠপোষকদের বিরাগভাজন হতে চাননি আর এই সব রচনার অন্যতম কারণই ছিল পৃষ্ঠপোষকদের অনুগ্রহ লাভ। অনেকক্ষেত্রে আবার এইসব পৃষ্ঠপোষকদের ইচ্ছানুসারেই গ্রন্থগুলি রচিত সর্বোপরি সমসাময়িককালের ঐতিহাসিক রচনায় যেমন প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান লাভ করা যায়, তেমনি অপরদিকে যেহেতু বস্তুগতভাবে (objectively) সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না, তাই এক্ষেত্রে অনেক ত্রুটিও থেকে যায়। এই কারণে প্রামাণিক ইতিহাস রচিত হতে পারে পরবর্তীকালেই।

এখন জিজ্ঞাস্য হল ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত অলিখিত ছিল? এর কারণ মুখ্যতঃ দ্বিবিধ—প্রথমত যথার্থ ঐতিহাসিক চেতনার অভাব, দ্বিতীয়ত অধ্যাত্ম মানসিকতা। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি যে আমাদের গৌরব করার মত কিছুই নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে যা কিছু আমাদের দ্বারা সাধিত হয় তার মূলে আছে দৈবানুকম্পা। মানুষ নিমিত্ত মাত্র, দেবতার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে বড় কিংবা ছোট কোন কাজই সমাধা করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করে এসেছি। এমন কি সাহিত্য বলতেও দেব-বন্দনাকে দীর্ঘকাল ধরে বুঝিয়ে এসেছি। ইউরোপের মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের এখানে একটা মূল পার্থক্য রয়ে গেছে। ইউরোপীয়রা নিজেদের শক্তি এবং দান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে যেখানে সচেতন, আমরা ভারতবর্ষের মানুষেরা সেক্ষেত্রে এই আত্মসচেতনতা সম্পর্কে, নিজেদের কৃতিত্ব সম্পর্কে গৌরবান্বিত হওয়াকে অসমীচীন বলে মনে করে এসেছি। আমাদের পুরাণ

ইতিহাসে তাই দেবকীর্তি বিধৃত হয়েছে। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও মানুষ হয় দেবতার অবতার, নতুবা দেবতার অনুগৃহীত। রামায়ণের রামচন্দ্রকে আমরা অবতার বলে মানি। আবার মহাভারতের যুধিষ্ঠির, অর্জুন সকলেই দেবোপম চরিত্রের অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, "বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।"[১]

এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত না হওয়ার জন্য যে সকল কারণের কথা বলা হ'ল, সেই সব কারণেই বাঙ্গালীরও কোন ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে রচিত হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, অধ্যাত্মসাধনায়, রাজনৈতিক চেতনায়, সমাজ-সেবায়, সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং জীবনের অন্যান্য বহুবিধ ক্ষেত্রে যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চার মূলেও সেই নবজাগৃতি পর্বে উদ্ভূত স্বাজাত্যবোধের চেতনাই বাঙ্গালীকে ইতিহাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্কিম দুঃখ করে বলেছেন, "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনল্যণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।"[২] বাঙ্গালীর বিশেষভাবে ইতিহাস চর্চার যে অনীহা, তার মূলে অবশ্য আমাদের দেশের দীর্ঘকালের পরাধীনতাও কাজ করেছে। প্রায় দুই শতাব্দী কালের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় জাতি হিসাবে যা কিছু আমাদের গর্বের, সেগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপপ্রচার চালান হয়েছে। আমাদের বোঝান হয়েছে যে আমাদের নিজস্ব গর্বের কিছুই ছিল না, ইংরেজরা আমাদের পরিত্রাতা হয়ে এসেছে, তাদের যা সবই গর্বের, সেগুলিই অনুকরণীয়। দুঃখের বিষয় তাদের সেই অপপ্রচারে আমরা প্রতারিত হয়েছিলাম। নিজেদের

গৌরবজ্ঞাপক কার্যাবলীর সন্ধানে অথবা আলোচনায় কোন প্রেরণা আমরা পাইনি। তাছাড়া জাতি হিসাবেও বাঙ্গালী সম্পর্কে বহুল প্রচলিত মন্তব্যটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে—তা হ'ল তার আত্মবিস্মৃতি। সংস্কৃতজ্ঞ ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের মতে ভারতীয় তথা বাঙ্গালীর যে কোন ইতিহাস নেই তার কারণ ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-কাণ্ডেরই নাকি অভাব ছিল। কিন্তু এই যুক্তি যে কত অসার, তা পরবর্তীকালেই প্রমাণিত হয়েছে।

বিশেষভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ইতিহাস সচেতনতার কারণগুলি এইবার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'নবজাগৃতির পর্ব' বলে। নবজাগৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন তথা অতীত ইতিহাসের মূল্যায়ণ একটা জাতি এই সময় নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতি রূপ সৌধের ভিত্তির সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হয়। অনুপ্রাণিত হয় নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যের প্রাচীনত্বের সন্ধানে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি অথবা ইতিহাস সম্পর্কে ইংরেজদের সুচিন্তিত অপপ্রচার আমাদের বিপথে চালিত করেছিল দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই ইংরেজদের প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলাম। ইংরেজদের ইতিহাস আছে, রোমানদের ইতিহাস আছে, গ্রীসের ইতিহাস আছে অথচ আমাদের ইতিহাস কোথায়? এই প্রশ্ন আমাদের মনে সেদিন জেগেছিল। তদুপরি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে ইংরেজদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করতেও আমরা সেদিন বিশেষ ভাবে ঐতিহ্যের গভীরতা সন্ধানে আগ্রহী হয়েছিলাম। ষ্টুয়ার্ট সাহেব, মার্শম্যান সাহেব কিংবা স্মেথব্রিজের মত অনেক সাহেব ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়ে নানা মিথ্যাচার করেছিলেন। এঁদেরই বক্তব্যে মারাঠা বীর শিবাজী দস্যু মাত্র, এঁরাই বিবৃত করেছেন হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীর মত চরম অনৈতিহাসিক ঘটনা। উনবিংশ

শতাব্দী হ'ল যুক্তির যুগ। আমরা এই যুগে দেবতার ওপর স্থান দিয়েছিলাম মানুষকে। এতদিন যে দৈব নির্ভরতা আমাদের বিনয়ী করে রেখেছিল, মানুষের কৃত কর্মকে দেবতারই পরোক্ষ অবদান বলে বিশ্বাস করে এসেছিলাম কিংবা মাহাত্ম্য কীর্তন যদি করতেই হয় তাহলে তা দেবতাদেরই একমাত্র প্রাপ্য—এই ধারণা পরিবর্তিত হল। আমরা নিজেদের কৃতিত্ব ও অবদানকে উপযুক্ত মূল্য দিতে শিখলাম। তাই স্বভাবতঃই আত্মবিস্মৃতির ঘোর অন্তর্হিত হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা, স্বাজাত্যবোধ স্থান পরিগ্রহ করল। ইতিহাস রচনার এবং ইতিহাস চেতনার উদ্বোধন ঘটল।

এবারে জাতির জীবনে ইতিহাসের প্রভাব এবং গুরুত্ব কতখানি সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে 'ইতিহাস' বলতে নিছক কতকগুলি সাল-তারিখ কিংবা রাজা-রাজড়ার কাহিনীকে বোঝান হচ্ছে না। রক্তাক্ত সংগ্রাম, সিংহাসন অধিকারের চক্রান্ত কিংবা নবাবীয়ানার বিবরণ আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু তা যথার্থ ইতিহাস পদবাচ্য নয়। ইতিহাস হ'ল একটা জাতির জাগ্রত চেতনা, তার সমাজ, সাহিত্য, সৃষ্টির অগ্রসরতা—এক কথায় সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়। বস্তুতপক্ষে ইতিহাস হ'ল, 'সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।'[৩] ইতিহাস হ'ল ঐতিহ্যের নামান্তর, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দীর্ঘকালের সংস্কার। তাই বলা চলে একটি জাতির জীবনে ইতিহাস লাগামের কাজ করে থাকে। ইতিহাস বিহীন জাতি লাগাম ছাড়া ঘোড়ার সঙ্গে উপমিত হতে পারে। সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে ইতিহাস বিহীন হতভাগ্য জাতি মুক্ত থাকে। পরিণামে তার ধ্বংস, পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যে জাতির ইতিহাস থাকে সেই জাতি সাময়িকভাবে নিজেদের নির্দিষ্ট ধারা থেকে বিচ্যুত হলেও পরবর্তীকালে সংশোধনের সুযোগ পায়। পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি জাতিকে সেই মাহাত্ম্য রক্ষাতেই শুধু সচেষ্ট করে না, ভবিষ্যতের স্বপ্নোজ্জ্বল পথেও অগ্রসর হতে প্রেরণা

যোগায়। এই কারণেই ইতিহাস বিহীন জাতি বড়ই হতভাগ্য, অনেকটা অনাথ সন্তানের মত, কিংবা দিক নির্ণয়ক যন্ত্র বিহীন জাহাজের অনুরূপ।

এইবার আমাদের দেশের যথার্থ ইতিহাস চর্চার পরিচয়টুকু গ্রহণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠানটির। আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও পুরাবৃত্তের আলোচনায় এবং আবিষ্কারে এই প্রতিষ্ঠান পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এদেশের শিক্ষিত মানুষকে দেশীয় সংস্কৃতি ও পুরাবৃত্তের অনুশীলনে এশিয়াটিক সোসাইটি যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে স্বীকার করতে হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস স্টুয়ার্ট সর্বপ্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটি হল **'History of Bengal'**। এরপর একে একে এগিয়ে আসতে থাকেন এদেশীয় পণ্ডিত-মনীষীরা এই প্রসঙ্গে আমরা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সদস্যবৃন্দ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখাদির নাম উল্লেখ করতে পারি। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বাঙ্গালার যথার্থ ইতিহাস রচনা ও ইতিহাস সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসার উদ্যোগ পর্ব ১৮১৪ থেকে শুরু হয়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বলেছেন। এই পর্বের সূচনার সঙ্গে যাঁর নাম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গবিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চায় বঙ্কিমের অবদান নেহাৎ কম নয়। তাঁর রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,' 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নদূত,' 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' রচনাগুলির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অধ্যাত্ম-জগতের মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দও ইতিহাসের আলোচনায় যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত 'ভারতে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ,' 'ভারতের রীতি-নীতি', 'ভারতে শিল্পচর্চা,' 'ভারতের নারী' রচনাগুলি থেকে স্বামীজীর ইতিহাসবোধ তথা ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বঙ্কিমের প্রেরণায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বালকদের পাঠার্থে রচনা করেন 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'। এরপর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান রচনা করেন **'History of Bengal'**। এই গ্রন্থটির অনুবাদকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত মনীষীবৃন্দ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত গুপ্ত রচনা করেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস'। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার যদুনাথ সরকার **'India of Aurangzeb'** গ্রন্থটি রচনা করে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। এই গ্রন্থটি অবশ্য প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর যে ইতিহাস চেতনার সূত্রপাত ঘটে, তা ক্রমশ পরিপুষ্ট হয় যাঁদের দ্বারা, তাঁরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চার মূল সন্ধান করলে তা যে নবজাগ্রত স্বাদেশিক চেতনায় পাওয়া যাবে তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার গ্লানি তখন আমাদের নিদারুণভাবে পীড়িত করছিল। আমরা তাই স্বাধীন হবার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করতে থাকি। সাহিত্যসেবী যাঁরা তাঁরা সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে স্বাদেশিক আন্দোলনকে জোরদার করায় অংশ নেন। আর এক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষভাবে অবলম্বন করেন টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থটির ওপর। স্বদেশ প্রেম প্রচারে নিছক তাত্ত্বিক বক্তব্য প্রকাশের তুলনায় কোন ঘটনার বা কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে তা তুলে ধরাকেই এদেশীয় লেখকেরা অনেক বেশী ফলপ্রসূ বলে সঙ্গত কারণেই মনে করেছিলেন। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে নিজেদের দেশের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অতীত কাহিনী দেশের মানুষকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে বলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোট-বড় প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিক বিশেষভাবে রাজস্থান কাহিনীর ওপর নির্ভর করেন। কারণ অতীত ভারতের শৌর্য-বীর্যের পরিচয়ে রাজস্থান ও মারাঠা দেশের মানুষের কৃতিত্ব অতুলনীয়। আত্ম-মর্যাদাবোধ,

দেশপ্রেম, মহান আ৲'র্শের কারণে চরম কৃচ্ছ্রসাধন—এসবই রাজস্থান কাহিনীর মধ্যে বর্তমা৲। আলেকজাণ্ডার থেকে শুরু করে ক্লাইভ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষ:ত্রে ভারত বারংবার পর্যুদস্তই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত।'[৪]

আর এইজন্যেই 'সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস ·… দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডেব রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল।'[৫]

বস্তুত 'রাজস্থান' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার মূলে সেদিনের ভারতের চারিত্রিক মহিমার ব্যাপক পরিচয় লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই যে মুখ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আলোচ্য গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বাঙ্গালী রচিত বিভিন্ন উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, ইতিহাসমূলক রচনা ও কাব্যে টডের অনুসরণ ও প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনাই স্থান পাবে।

জেমস টড ও মেরী হিটলীর সন্তান দ্বিতীয় জেমস্ টড ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ ইসলিংটনে জন্মগ্রহণ করেন। টডের দুই খুল্লতাত ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বেসামরিক সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে টড প্যাট্রিক হিটলীর প্রয়াসে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ সামরিক কলেজের ছাত্র হিসাবে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন। **woolwich**-এ কিছুকাল শিক্ষানবিশী করার পর টড ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাঙ্গালা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

কলকাতায় উপস্থিত হয়ে তিনি দ্বিতীয় ইউরোপীয় সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে তিনি লেফ্টেনাণ্ট পদে উন্নীত হয়ে চতুর্দশ পদাতিক বাহিনীতে (**14th Native Infantry**) যোগদান করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধিয়া রাজের রাজসভায় নিযুক্ত দূত ও বিদেশীয় রাজ প্রতিনিধি **Graeme**

Mercer-এর সঙ্গে প্রেরিত রক্ষক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে টড ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে কমিশন প্রাপ্ত হন।

কিছু সময়ের জন্য টড লর্ড ওয়েলেসলী পরিকল্পিত Moluccas অভিযানে সহায়তা করার জন্যে নৌ-সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং 'Mornington' নামক যুদ্ধ জাহাজে কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে টড ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। সেই সঙ্গে তিনি Resident-এর রক্ষক বাহিনীর প্রধান পদে বৃত হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তৎকালীন Resident Richard Strachay তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় সহকারী রূপে মনোনীত করেন। মহারাজার শিবিরের সঙ্গে পর্যটনের সময় এবং তার পরবর্তীকালেও অর্থাৎ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবির গোয়ালিয়রে অবস্থান করার সময় টড জরীপ এবং ভৌগোলিক সংবাদাদি সংগ্রহে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসকে একটা মানচিত্র দাখিল করেন। এই মানচিত্রেই সর্বপ্রথম 'Central India' কথাটি ব্যবহৃত হয়। টড অবশ্য 'Central India' বলতে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের সমষ্টিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড হেস্টিংস পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টডের স্থানীয় অঞ্চলের জ্ঞান বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার প্রধানরা যখন প্রস্তাবিত রক্ষামূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হলেন, তখন টড গভর্ণর জেনারল কর্তৃক পশ্চিম রাজপুতানায় ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) রূপে নিযুক্ত হন এবং অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত এই পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শান্তি ও বিশ্বাস স্থাপনে টডের আন্তরিক প্রয়াসে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পশ্চিম রাজপুতানায় প্রায় তিন শতাধিক জনশূন্য নগরী ও গ্রামে পুনরায়

জনবসতি গড়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বাণিজ্য দ্রব্যাদির চলাচলের ওপর যে কর ধার্য হ'ত, তা প্রত্যাহৃত হওয়া সত্ত্বেও রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তী পাঁচ বছরে টড সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রধান পর্যায়ের সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা লাভ করেছিলেন। টড একাধিক রাজ পরিবারকে উদ্ধার করেছিলেন—এঁদের মধ্যে মারাঠাদের আক্রমণে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত ও চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন উদয়পুরের রাণারাও ছিলেন।

Bishop Heber ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজপুতানা পর্যটন করেছিলেন। তখন তিনি জেনেছিলেন যে টডের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত রাজপুতানায় সমৃদ্ধি বলতে কিছুই ছিল না। তিনি আরও জেনেছিলেন যে চোর এবং পিণ্ডারীরা বাদে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসতেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে তাঁর অত্যধিক ঘনিষ্ঠতাই শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ রূপে দেখা দেয়। টডের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হন এবং কলকাতার সরকারী মহল টডকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে ধরে নেন। ফলে তাঁর ক্ষমতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ চিত্তে পদত্যাগে বাধ্য হন। হেবার-এর বিবরণে উপরোক্ত ঘটনারাজির সমর্থন পাওয়া যায়—

"His misfortune, was that, in Consequence of favouring native princes so much, the Government of Calcutta were led to suspect him of Corruption, and Consequently to narrow his powers and associate other officers with him in his trust till he was disgusted and resigned his place." ৬

অথচ উল্লেখযোগ্য যে টডের দুর্নীতি বিষয়ে তৎকালীন কলকাতা-স্থিত সরকারী মহলের সংশয় ছিল সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। বিশপ হেবারও মন্তব্য করে বলেছেন, 'I believe, that their suspicions

were groundless.'[৭] যাইহোক, সর্বমোট ২৪ বছর ভারতবর্ষে চাকরী করার পর মাত্র ৪০ বছর বয়সে টড তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন! যদিও টড তাঁর পদত্যাগ পত্রে কারণ হিসাবে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত কারণ যে অন্যবিধ ছিল, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া অস্বাস্থ্য যে তাঁর পদত্যাগের কারণ ছিল না তার অন্য প্রমাণ হ'ল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পদত্যাগের পরই তিনি ঘুরপথে বোম্বাই পর্যটনে যান এবং সেই পর্যটনজনিত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'Travels in western India' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটি অবশ্য টডের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে টড বোম্বাই থেকে ইংলণ্ডের উদ্দেশে পাড়ি জমান। এদেশে তিনি আর কখনও আসেন নি।

২৪ বছরের চাকরী জীবনের মধ্যে টড ১৭ বছর অতিবাহিত করেন মধ্যভারত এবং রাজপুতানায়। সপ্তদশবর্ষ ব্যাপী মধ্যভারত এবং রাজপুতানায় কর্মজীবন অতিবাহিত করার সময়ে তিনি এই সব স্থানের রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি নানাবিধ উপকরণাদি সংগ্রহে অক্লান্ত নিষ্ঠার পরিচয় দেন। অবশ্য টড নিজে লিখেছেন—

'Though I never penetrated personally further into the heart of the Indian desert than Mundore···my parties of discovery have traversed it in every direction, adding to their journals of routes living testimonials of their accuracy, and bringing to me natives of every t'hue from Bhutnair to Omurkote and from Aboo to Arore. The journals of all these routes, with others from Central and western India, form eleven moderate sized folio volumes.'

টড তাঁর প্রাপ্ত বেতনের অতিরিক্ত অংশ সবই এদেশীয় অনুসন্ধানকারীদের পেছনে ব্যয় করতেন।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও মানব জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে টডের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাবোধ উইলিয়াম জোন্স এবং অন্যান্য ভারত-তত্ত্ববিদদের রচনার দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল। টড নিজে অভিজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না ঠিকই এবং তিনি তাঁর জ্ঞাতব্য তথ্যাদির অধিকাংশই সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর গুরু জৈন-জ্যোতি জ্ঞানচন্দ্র এবং তাঁর নিযুক্ত অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে। অবশ্য টড নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আধুনিক বিচারে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না। তাই এঁদের সংগৃহীত তথ্যাদির ওপর নির্ভর করায় টডের রচনায় স্বভাবতঃই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে টড গেজেটেড মেজর পদে এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে লেফটেনান্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হন। ৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর টড লণ্ডনের এক চিকিৎসক **Clutterbuck**-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের দুটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে টড **Count de Boigne** পর্যটন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর **Lombard Street**-এ বৈষয়িক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকাকালীন তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৭ই নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বৎসর। ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার পর তিনি আরও ১২ বছর জীবিত ছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁর অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত ঐতিহাসিক ও অন্যান্য উপকরণাদির বিন্যাস সাধনে অতিবাহিত হয়।

এদেশে অবস্থানকালে টড এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এক সময় তিনি এখানকার গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালনের পূর্বে অবশ্য তিনি এখানে তাঁর প্রিয় বিষয় সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

টডের 'রাজপুত কাহিনী' দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। দু'টি খণ্ড যথাক্রমে সম্রাট চতুর্থ জর্জ এবং চতুর্থ

উইলিয়ামকে উৎসর্গীকৃত। টডের গ্রন্থসম্পর্কে সমসাময়িক কালের এক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে—

"Colonel Tod deserves the praise of a most delightful and industrious Collector of materials for history, and his own narrative, vigour and perspicuity. Though not always Correct, it is not seldom highly animated and picturesque. The faults of his work are inseparable from his nature; it would have been almost impossible to mould up into one Continuous history the distinct and separate annals of the Various Rajput races. But, on the whole, as no one but Colonel Tod could have gathered the materials for such a work, there are not many who Could have used them so well."[৮]

টড কবি চান্দ এবং অপরাপর উপজাতীয় চারণ কবিদের রচিত মহাকাব্য এবং গাথাগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থে এই সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপকরণাদি বিস্তৃত পরিসরে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে চারণ কবিগণ কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন যথার্থ ঐতিহাসিক সত্যকে তাঁদের গাথা কবিতায় স্থান দিয়ে থাকেন, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে সুতীব্র আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সত্যের বিকৃতি সাধনও করে থাকেন। যেমন জয়লাভের বর্ণনায় অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করে বিপরীত-ক্রমে পরাজয়কে কিঞ্চিৎ লঘুভাবে বর্ণনা করতে তাঁরা প্রলুব্ধ হন। বিশেষতঃ রাজপুতানায় যেখানে উপজাতীয় বিরোধ এবং ব্যক্তিগত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম আকার ধারণ করেছিল, সেক্ষেত্রে এরূপ মানসিকতাই যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তা বলাই বাহুল্য। এই কারণে চারণ কবিদের রচনাকে যথার্থ ঐতিহাসিক গুরুত্বদানের পরিবর্তে কবিদের ব্যক্তিগত এবং তাঁদের সমসাময়িক যাঁরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী তথা মানসিকতার অভিব্যক্তি রূপে গ্রহণ করা উচিত।

'In fact, bardic literature is often useful, not as evidence of occurrences in antiquity, but as the writer and his Contemporaries supposed that they occurred. The mind of the poet, with all its prejudices, projects itself into the distant past.' [৯]

টড রাজপুত জাতির শৌর্য ও বীর্যে এতদূর আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি নিজেই যেন তাদের একজনে পরিণত হয়েছিলেন—

'He not only knew them through and through their manners, their tradition, their character, and their ideals; but so great was his admiration for their many noble qualities, and so Completely did he identify himself with their interests, that by the time he left India he had almost become a Rajput himself'[১০]

টডের রাজস্থান কাহিনীর গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলাবাহুল্য মাত্র। যে সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং ভৌগোলিক আলোচনার সবেমাত্র সূত্রপাত হয়েছে। অতএব স্বভাবতঃই টডের নানাবিধ ত্রুটি ও বিশেষতঃ অনৈতিহাসিক তথ্যাবলী সম্বন্ধে সমালোচকেরা নানা বিরূপ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। তথাপি সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে রাজস্থানের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে টডের গ্রন্থ অপরিহার্য –

'When, if ever, a new history of the Rajputs Comes to be written, it must be largely based on Tod's Collections. [১১]

টডের গ্রন্থের অপরিহার্যতা বিষয়ে জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে—

'Notwithstanding its author's occasional inaccuracies, and the somewhat glaring defects of his style, the Annals and Antiquities of Rajasthan still holds its place as the

standard authority on the history of the Rajasthan States of subsequent writers of Indian history, it would be difficult to point to a single one who has not been benefited directly or indirectly by Tod's labours.'[১২]

এ পর্যন্ত গেল রাজস্থান কাহিনীর গুরুত্বের কথা। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই গ্রন্থখানি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এর কারণটি বর্ণিত হয়েছে—

"বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত।"[১৩] বাঙ্গালা সাহিত্যকে রাজস্থান কাহিনী উল্লেখযোগ্য ভাবে যে প্রভাবিত করেছে তার কারণ সন্ধান পরবর্তী আলোচনায় বিস্তৃতভাবে করা যাবে। আপাতত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবীণ ইতিহাসকারের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যেতে পারে—

"The begining of the nineteenth Century introduced English language and European thought in Bengal. Bengali which never had any pure literature now began to develop. The Concept of literature was to some extent changed. The writers, who had English models before them had nothing to do with religion although they did not shake off the Puranic tradition of religion and morality. To these new writers Tod's Annals of Rajasthan opened rich field of new and delectable subject matter for their literary creations."[১৪]

পাদটীকা

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড, সংসদ সংস্করণ ; ৪র্থ মুদ্রণ) পৃঃ ৩৩০।

২. ঐ ঐ ঐ

৩. ঐ ঐ ঐ

৪. বৃহত্তর ভারত; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩শ খণ্ড; জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) পৃ: ৩৫১।

৫. ঐ ঐ ঐ

৬. Introduction by william Crooke, C. I. E (Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Oxford University Press ; 1920 ; p p XXVII—XXVIII)

৭ Ibid.

৮. Quarterly Review : (Vol XlVIII oct—Dec) 1832 p p 381

৯. Introductory notes by William crooke (Oxford University Press, 1920)

১০. Preface by C. H. P. Vogel (Annals and Antiquities of Rajasthan)

১১. Introductory notes by william crooke (Oxford University Press, 1920)

১২. Preface by C. H. P. Vogel (Annals and Antiquities of Rajasthan)

১৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। (নবম খণ্ড; ১ম সংস্করণ) পৃ: ৩২৪।

১৪. Dr. Sukumar Sen's Lecture on 'Rajasthan and Bengal in literary Contact' on 10.12.75 at the Rajasthan Information Centre, Calcutta

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক বিচারে টডের 'রাজস্থান'

এই অধ্যায়ের স্বল্প পরিসরে আমরা আলোচনা করব টডের 'রাজস্থান'কে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কি দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং বিশেষত আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় 'রাজস্থানে'র অনৈতিহাসিকতা কতখানি ধরা পড়েছে। অবশ্যই সুবিশাল 'রাজস্থান' গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচার যে স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে সম্ভব নয় তা স্বীকার করে নিয়ে এইটুকু শুধু মাত্র বলা যেতে পারে যে 'রাজস্থানে'র যে সব কাহিনী বা চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে গৃহীত হয়েছে, বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সবিশেষ পরিচিত, প্রস্তাবিত আলোচনায় সেই সব কাহিনী এবং চরিত্রই সীমাবদ্ধ থাকবে।

রাজপুতানার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় চরিত্র হ'ল রানা প্রতাপ। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে আকবরের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত রানা প্রতাপের জীবনী কিংবদন্তীতে পরিণত। টড তাঁর গ্রন্থে অসীম শ্রদ্ধা সহকারে প্রতাপের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশে রানা প্রতাপ সম্পর্কিত কাহিনী সমূহ রূপায়িত হতে দেখা গেছে। প্রতাপের সঙ্গে ভ্রাতা শক্তসিংহের বিরোধ. প্রতাপ কর্তৃক স্বেচ্ছায় তাঁর আতিথ্যগ্রহণকারী রাজা মানসিংহের অপমানিত হওয়া, হলদিঘাটের কঠিন সংগ্রামে রাজকুমার সেলিমের অস্ত্রের জন্য জীবন রক্ষা, চৈতকের সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রতাপের পলায়ন, পরাজিত প্রতাপের অনুসরণকারী খোরাসান ও মুলতান সওয়ারদ্বয়কে হত্যার মাধ্যমে শক্তসিংহ কর্তৃক তাঁর দীর্ঘ বৈরিতার অবসানে প্রতাপের সঙ্গে পুনর্মিলন,

ভীলদের আশ্রয়ে প্রতাপের সপরিবারে কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা, ভগ্ন-হৃদয় প্রতাপের মেবার ত্যাগের সংকল্প এবং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী ভামসার অর্থানুকূল্যে নবোদ্যমে তাঁর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ও পরিণামে মেবারের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার ইত্যাদি ঘটনাগুলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। এইসব রোমাঞ্চকর ঘটনা আমাদের আজও বিশেষভাবে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রতাপ সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের পরিচিত ও প্রচলিত ঘটনাগুলির সত্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ভাট ও চারণ কবিরা প্রতাপের জীবনীকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রতাপ সম্পর্কিত সেই সব অতিরঞ্জিত, কাল্পনিক অনৈতিহাসিক কাহিনী সমূহই প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং কবি ও সাহিত্যিকদের সেইসব ঘটনা কাব্য ও সাহিত্য রচনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই এ'কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে ইতিহাসের রানাপ্রতাপ আর সাহিত্যে চিত্রিত রানা প্রতাপ এক ব্যক্তি নন।

টডের বর্ণনানুযায়ী সোলাপুর যুদ্ধ বিজয়ের পর প্রত্যাবর্তনকালে রাজা মানসিংহ স্বেচ্ছায় প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। উদয় সাগরেরতীরে মানসিংহের সম্মানে আয়োজিত ভোজের অনুষ্ঠানে রানার যোগদানের অসম্মতির ফলে বিনা ভোজনে অপমানিত মানসিংহের প্রস্থান শেষ পর্যন্ত রানার বিরুদ্ধে রাজা মানের মেবার অভিযানের কারণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিক শ্যামলদাসজী এবং গৌরীশঙ্কর ওঝা মোটামুটিভাবে এই ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু অপরপক্ষে কোন কোন ঐতিহাসিক রাজা মানের সঙ্গে প্রতাপের বিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত এই কাহিনীর সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। বলা হয়েছে, 'মানসিংহের নিমন্ত্রণ ও অপমানের ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা; ইহাতে মানসিংহ ও প্রতাপের সাক্ষাৎকার ছাড়া অন্য এক বর্ণও সত্য নয়।'[১] বাস্তবিক মেবারের

নব-নির্বাচিত শাসক প্রতাপের পক্ষে প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল শক্তির বিরুদ্ধাচারণের পূর্বে পূর্ব প্রস্তুতির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।

'The new ruler of Mewar naturally required time to reorganise and Consolidate his resources before he could adopt any vigorous policy towards the Mughal Government'[২]

তাই প্রতাপ কর্তৃক রাজা মানসিংহের অপমানিত হ'বার ঘটনাটিকে সত্য নয় বলেই ধরা যেতে পারে। এরূপ অনুমানের অপর অমোঘ যুক্তি হ'ল—প্রতাপের কাছ থেকে রাজা মানের প্রত্যাবর্তনের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই রাজা ভগবান দাসের সঙ্গে রানার সাক্ষাৎকার। এমন কি ভগবান দাসের সাক্ষাৎকারের অল্পকাল পরেই টোডরমলের সঙ্গেও প্রতাপের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মানসিংহ প্রতাপ কর্তৃক অপমানিত হলে অনতিকালের মধ্যে ভগবানদাস এবং টোডরমলের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎকার কোনমতেই সম্ভব হ'ত না। বরং প্রতাপ মানসিংহকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং সম্রাট প্রেরিত পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছিলেন বলেই আধুনিককালের ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন—

'The Rana received Raja Man Singh well and accepted the robe of honour sent to him by Akbar.'[৩]

এমনকি রাজকুমার অমরসিংহকে[৪] ভগবানদাস সমভিব্যাহারে রানা প্রেরণ করেছিলেন সম্রাটের কাজে আত্মনিয়োগ করতে—

'sent his son Amar Singh along with him to pay homage to the Emperor and enter his service. The Rana himself wished to be excused for his inability to attend. Bhagwan Dass returned with Amar Singh to Fathepur in November, 1573.'[৫]

টডের 'রাজস্থানে' শিকার উপলক্ষ্যে প্রতাপের সঙ্গে শক্তসিংহের যে বিরোধের কথা বর্ণিত হয়েছে তাও যথার্থ নয় বলেই আধুনিককালের ঐতিহাসিকের ধারণা। এমন কি শক্তসিংহের মুঘল শিবিরে যোগদান, শক্তসিংহ কর্তৃক খোরাসানী ও মুলতানী সওয়ারদ্বয়ের আক্রমণজনিত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বিপন্ন প্রতাপকে রক্ষা প্রভৃতি ঘটনাকেও নিছক মিথ্যা বলেই আধুনিককালের ঐতিহাসিকেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিক ড. কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে, শক্তসিংহ মোগলের পক্ষে বা বিপক্ষে হলদিঘাটে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং খোরাসানী ও মুলতানী সওয়ার এবং খোরাসানী মুলতানী কা অগ্‌গল ভাটের কল্পনামাত্র।'[৬] এমন কি প্রতাপ ও শক্তসিংহের তথাকথিত বিরোধ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'প্রতাপের রাজ্যারোহণের পর এঘটনা হয় নাই ইহা সুনিশ্চিত, এবং রাজ্যারোহণের পূর্বেও তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাদের কারণ বিদ্যমান ছিল না।...... প্রতাপের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে শক্তসিংহ সম্বন্ধীয় গল্পটি বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে ;'[৭] হলদিঘাটের রণাঙ্গন থেকে পলায়নকারী প্রতাপকে খোরাসান ও মুলতান সৈন্যের অনুসরণের অবাস্তবতা বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকের মতৈক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হলদিঘাটের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারী ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর বর্ণনানুযায়ী যুদ্ধের পর অতিশয় ক্লান্ত মোঘল সৈন্যগণ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে অসমর্থ ছিল। পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিকের বক্তব্যেও এই অভিমতেরই সমর্থন লক্ষ্য করা যায়—

'The Rana, having been wounded, fled to the hills, mounted on his beloved steed Chaitak, and the Victors were to exhausted to pursue him,'

আধুনিককালের অপর এক ঐতিহাসিকের অভিমতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

'The Mughal army could not pursuethe retreating Mewar

troops owing to excessive heat and the fact that they had been roughly handled and were quite tired.' [৯]

টড বলেছেন,

'Prince Selim, the heir of Delhi, led the war, guided by the Councils of Raja Maun and the distinguished apostate son of Sagurji, Mohabat khan' [১০]

কিন্তু হলদিঘাটের যুদ্ধের সময় (June 18, 1576) রাজকুমার সেলিম ছিলেন সপ্তমবর্ষীয় বালক মাত্র। অতএব তাঁর পক্ষে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল তা বলা বাহুল্য মাত্র।

'Rajpoot tradition, as reported by Tod, represents Prince Salim as being in Command of the Mogul army, which is absurd, the Prince being then in his seventh year. Man Singh had the assistance of Asaf Khan (II), and other officers of distinction.'[১১]

অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে রানাপ্রতাপ কর্তৃক কুমার সেলিমের আক্রান্ত হওয়া ও অশ্বের জন্য তাঁর জীবন রক্ষার যে বিবরণ টড দিয়েছেন—

'His guards fell before Pertap, and but for the steal plates which defended his howda, the lance of the Rajpoot would have deprived Akbar of his heir. His steed, the gallant chytuc nobly seconded his lord, and is represented in all historical drawings of this battle with One foot raised upon the elephant of the Mogul, while his rider has his lance propelledagainst his foe. The Conductor, destitute of the means of defence, was slain, when the infuriated animal, now without control, carried off Selim.'[১২]

—সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক বলেই প্রমাণিত হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, শক্তসিংহ কর্তৃক মূলতানী ও খোরাসানী ঘোড়সওয়ারদ্বয়কে

হত্যাপূর্বক অসহায় প্রতাপের জীবন রক্ষার কাহিনীও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত। সেই সঙ্গে এখন এও প্রমাণিত হ'ল যে শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের জীবন রক্ষার কারণে খোরাসানী ও মূলতানী সৈন্যদ্বয়কে হত্যার উদ্দেশ্য সেলিমের কাছে ব্যক্ত করা ও সেলিম কর্তৃক তাঁকে ক্ষমা-প্রদানের বিষয়ে টড যা বলেছেন—

'Prince Selim pledged his word to pardon him if he related the truth; when Sukta replied, "the burthen of a kingdom is on my brother's shoulders, nor could I witness his danger without defending him from it" Selim kept his word, but dismissed the future head of the Suktawuts'[১৩]

—তাও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত, অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন।

চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ঘাসের বিছানায় শয়ন, দাড়ি কামান থেকে বিরত হওয়া, সোনা-রূপার থালায় ভোজন করা থেকে বিরত থাকা, নাকাড়া বাদ্য মেবার বাহিনীর সম্মুখে বাজানোর পরিবর্তে পেছনে বাজানোর রীতি প্রচলন করা—প্রতাপের তথাকথিত এইসব কঠিন শপথ বা আদেশ বিষয়ে টড যা বলেছেন, কিংবা অর্থাভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব জ্ঞানে প্রতাপের মেবার ত্যাগের সংকল্প এবং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী ভামসা কর্তৃক রানাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের ঘটনা সকল গৌরীশংকরজী অনৈতিহাসিক ও অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণ করেছেন। তবে অপর একজন ঐতিহাসিক ড. কালিকারঞ্জন কানুনগোর বর্ণনানুযায়ী—মালব লুণ্ঠনের পর মন্ত্রী ভামসা ২০,০০০ মোহর ও ২৫ লক্ষ টাকা চুলিয়া গ্রামে মহারাণাকে নজরাণাস্বরূপ প্রদান করেছিলেন।[১৪] বিকানীর রাজ রাজসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি পৃথ্বীরাজের কবিতা পাঠে ভগ্নমনোরথ প্রতাপের আকবরের অধীনতা অস্বীকারের সংকল্প বিষয়ে টডের যে বিবরণ ডঃ কানুনগো তাও অনৈতিহাসিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পরাজিত প্রতাপের ভীলদের আশ্রয়ে পর্বতগুহায় বাস, এই সময়ে

ঘাসের বীজে প্রস্তুত সামান্য রুটি ভক্ষণ করে মহারাণা ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানাদির জীবন-ধারণ, কন্যার জন্য রক্ষিত রুটি নিয়ে বন-বিড়ালীর পলায়ন, এই কারণে ক্ষুধার্ত কন্যার আর্তনাদ ও প্রতাপের সাময়িক ভাবে মানসিকতার পরিবর্তন প্রভৃতি বিবরণও অনৈতিহাসিক বলেই কালিকারঞ্জন অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'প্রথমতঃ; উত্তরে কুম্ভলমীর হইতে দক্ষিণে ঋষভদেব পর্যন্ত অনুমান নব্বুই মাইল লম্বা, এবং পূর্বে দেবারী হইতে পশ্চিমে সিরোহী সীমান্ত পর্যন্ত সত্তর মাইল প্রস্থ পার্বত্যভূমি কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রতাপের হস্তচ্যুত হয় নাই; এই স্থান সমতল না হইলেও সুজলা, সুফলা এবং গরু মহিষ ইত্যাদিও এ অঞ্চলে প্রচুর।' [১৫] তবে নিঃসম্বল, অসহায় ও নিরাশ্রয় প্রতাপের প্রাণ-রক্ষার্থে যাযাবরবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক স্থান থেকে স্থানান্তরে তাড়িত হবার কথা এবং শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগের বিষয়ে অপর এক ঐতিহাসিক স্বীকার করে বলেছেন—

'The resources of the Rana were put to so much strain that his future seemed to be entirely dark. He was literally chased from hill to hill and valley to valley, suffering untold hardships' [১৬]

প্রতাপের অবর্ণনীয় দুঃখবরণ এবং মহানুভবতায় সহানুভূতিসম্পন্ন সম্রাট আকবর প্রসঙ্গে টড বলেছেন ঃ

'Such inflexible magnanimity touched the soul of Akbar and extorted the homage of every chief in Rajasthan.' [১৭]

কিন্তু আধুনিককালের ঐতিহাসিক টডের এই বক্তব্যকে দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়—

'The gallant resistance offered and the 'inflexible magnanimity' displayed by Rana Prtap Singh for many Years were believed by Tod to have ultimately touched the heart of Akbar, and to have induced him to refrain from

disturbing the repose of his brave rival, for a Considerable time before the death of the Rana, ··· But that Charming hypothesis is baseless. The evidence of both Muslim and Jesuit historians proves in Contestably that Akbar to the end of his life was eager to destroy the Rana, and was held back from doing so only by the refusal of his son and great officers to undertake an effective Campaign in the wilds of Mewar.'[১৮]

পরিশেষে বলতে হয় প্রতাপ সম্পর্কিত দীর্ঘকালের প্রচলিত আখ্যান ও কিংবদন্তীসমূহের অধিকাংশের যাথার্থ অস্বীকৃত হলেও রানা প্রতাপের চরিত্র মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব কিন্তু বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। শেষ পর্যন্ত সকল ঐতিহাসিকই রানা প্রতাপের শ্রেষ্ঠত্বকে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিশেষতঃ স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের চেতনায় রানা প্রতাপ জ্বলন্ত প্রেরণা রূপে চিরকাল বিরাজ করবেন নিঃসন্দেহে।

টডের 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালাসাহিত্যের আর এক উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে পদ্মিনীর আখ্যানাংশ। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকেরা পদ্মিনীর উপাখ্যান সম্পর্কেও নানা প্রশ্নের অবতারণা করে এই সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। কর্ণেল টড পদ্মিনীর আখ্যানাংশ মেবারের ভাটদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আবার ভাটেরা এই আখ্যান গ্রহণ করেছিল মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবত' নামক সুবিখ্যাত কাব্য থেকে। মহম্মদ জায়সী স্বয়ং তাঁর কাব্যের শেষে চিতোরকে দেহ, রাজাকে (রতনসিংহ) মন, সিংহল দ্বীপকে হৃদয়, পদ্মিনীকে জ্ঞান এবং সর্বোপরি আলাউদ্দীনকে মায়ার প্রতীকরূপে অভিহিত করেছেন। অতএব জায়সী রচিত কাব্যটিকে ঐতিহাসিক কাব্যের মর্যাদা দানের পরিবর্তে রূপক কাব্যের মর্যাদাদান করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু পদ্মিনীর আখ্যানাংশের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাসী ঐতিহাসিকের বক্তব্য ঃ

'The Mewar tradition which accepts the story is a very old one, handed down from generation to generation.'[১৯]

কিন্তু এর উত্তরে বলা যেতে পারে—

'Tradition is no doubt a source of history but it is surely the weakest one, and until it is Corroborated by Contemporary evidence—literary, historical, epigraphical and numismatical—it Cannot be accepted as true history.'[২০]

মহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবত' কাব্য রচনার ৭০ বৎসর পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ফেরিস্তাকেও পদ্মিনীর বিবরণ দান করতে দেখা গেছে। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনায় চিতোরের রানার নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এমন কি পদ্মিনীর সঙ্গে রতন সিংহের প্রকৃত সম্পর্ক বিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। পদ্মিনী রতনসিংহের পত্নী না কন্যা—এ বিষয়ে তাঁর মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ছিল। ঐতিহাসিক হাজিউদ্দাবীরও তাঁর রচনায় রতন সিংহের নামোল্লেখ পযন্ত করেননি। এবং তিনি 'পদ্মিনী' বলতে রমণী বিশেষের পরিবর্তে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্টোর অধিকারিণী স্ত্রীলোককেই অভিহিত করেছেন। এমন কি চিতোর অধিকারের পূর্বে অথবা রতন সিংহের সুলতানের হাতে বন্দী হওয়ার পরে পদ্মিনীকে লাভের দাবী জানান হয়েছিল, সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয় না।

জায়সীর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ঐতিহাসিক আবুল ফজলকেও পদ্মিনীর নামোল্লেখ করতে দেখা যায়নি। আবুল ফজলের বর্ণনায় এইটুকু মাত্র উল্লিখিত হয়েছে—

'Sultan Alauddin Khilji, ruler of Delhi, heard that Rawal Ratan chief of Mewar possessed a most beautiful woman-' (Ain-i-Akbari, II 269).

আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আমীর খসরু। কিন্তু তাঁর গ্রন্থেও পদ্মিনীর উপাখ্যান অনুল্লিখিত রয়েছে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেও তাঁকেও কিন্তু পদ্মিনী, রতন সেন, লক্ষ্মণসিংহ প্রভৃতি কারও বিষয়েই উল্লেখ করতে দেখা যায় নি।

টড পদ্মিনীকে সিংহলরাজ হামীর শংকের কন্যারূপে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা বলেছেন রতন সিংহের সমসাময়িক সিংহলরাজ ছিলেন চতুর্থ প্রকরমবাহু।[২১]

আলাউদ্দীন কর্তৃক আয়নায় একবারের জন্য পদ্মিনীর রূপ দর্শনের অনুরোধ-জ্ঞাপন ও রানা কর্তৃক সেই অনুরোধ রক্ষা বিষয়ে টড যা বর্ণনা করছেন, সে সম্বন্ধেও আধুনিক কালের ঐতিহাসিকের অস্বীকৃতি বর্তমান :

'This is Unbelievable. Ratan who successfully fought the Muslims for eight Years cou'd n ver have Consented to satisfy such a humiliating and absurd request of Alauddin.'[২২]

টড পদ্মিনীকে ভীমসিংহের পত্নীরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পদ্মিনীর অস্তিত্বকে স্বীকার করলে তাঁকে রতনসিংহের পত্নী বলেই মেনে নিতে হয়। কবিরাজ শ্যামল দাসজী তাঁর রচিত মেবারের ইতিহাসে ভীমসিংহকে লক্ষ্মণসিংহের পিতামহ এবং আলাউদ্দীনের সমসাময়িক কালে সমরসিংহের পুত্র রতন সিংহ মেবারের রানা ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো পদ্মিনীর উপাখ্যান সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'মধ্যদেশের রতন সেন নামে কোন রাজার পদ্মিনী স্ত্রী বিষয়ক কোন কাহিনী অযোধ্যায় প্রচলিত ছিল। মুসলমান

কবি রচিত কাহিনীতে মুসলমান ইতিহাসের পদ্মিনী রাণীকে খোঁজা বৃথা।'[২৩] কালিকারঞ্জন আরও বলেছেন :

'ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসে মিবার-রাজ রত্নসিংহের মৃত্যুর (১৩০৩ খৃঃ) ২৩৭ বৎসর পরে রাণী পদ্মিনী বা পদ্মাবতীর জন্ম, বিবাহ ও সহমরণ কবি জ্যায়সীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।'[২৪]

অধিকাংশ ঐতিহাসিকই শেষ পর্যন্ত পদ্মিনী সম্পর্কে প্রচলিত উপাখ্যান সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—

'পদ্মাবত, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা এবং টড সাহেবের লিখিত কথাগুলির যদি কোন মূল (ভিত্তি) থাকে, তবে তাহা এটুকুমাত্র—যথা—ছয়মাস অবরোধের পর আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেন। চিতোরের রাজা রত্নসিংহ এই যুদ্ধে লক্ষ্মণসিংহ ইত্যাদি অনেক সামন্তের সহিত মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার রাণী পদ্মিনী অন্যান্য পুর মহিলার সহিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন; এইরূপে চিতোর কিছুদিনের জন্য মুসলমানের অধিকারে আসিল। বাকি সমস্ত কথাই কাল্পনিক।'[২৫]

ঐতিহাসিক ডঃ লাল ও মোটামুটি ভাবে এই মতকেই সমর্থন জানিয়েছেন লক্ষ্য করা যায়—

'Setting aside the traditional narratives of the story the true facts are that Sultan 'Alauddin' invaded Chittor in the year 1303 and after a hard fight of about eight months Captured it. The brave warriors died fighting the invaders; the brave Rajput women perished in the flames of Jauhar. Among those who perished was perhaps a Queen of Ratan Singh whose name was Padmini. Except these bare facts all else is a literary Concoction and lacks historical support.'[২৬]

টড মহারাণা রাজসিংহ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি সমগ্র হিন্দু-সমাজের মুখপাত্র স্বরূপ ঔরঙ্গজীব কর্তৃক জিজিয়াকর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে

তীব্র প্রতিবাদ করে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার উপযুক্ত তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন যে জিজিয়াকর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেছিলেন মারাঠা বীর শিবাজী। যদুনাথ টড কথিত ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশে রাজসিংহ লিখিত পত্র সম্বন্ধে বলেছেন—

The London M. S. ascribes i's authorship to Shivaji, the Calcutta M. S. to Sambhaji, and Tod to Maharana Raj Singh. Now as the tax is spoken of as recently imposed and the Emperor's war wih the writer as a thing of some duration, we can safely leave out Sambhaji Then, at the end of it the writer defies Aurangzib to levy the tax from "the chief of the Hindus," this person could not have been Rajah Ram Singh of Jaipur, first because the Hindus Know of no prince of nobler birth than the Maharana of Udaipur, descendant of Rama, and secondly because the House of Jaipur has ever been loyal to the paramount power and would not have disobeyed an Imperial mandate to pay Jazia on the Other hand, Aurangzib in making peace with the Maharana tacitly agreed to exempt his Country from Jazia (ome's Fragments ; P 165) Hence the Conclusion of the letter is really a taunt flung at Aurangzib. The writer, therefore, somebody other than Raj Singh, i. e, he must have been Shivaji. The internal evidence, too, is very strong in favour of a dreaded ravager of Mughal territory and a ruler of universal toleration, such as Shivaji undoubtedly was.'[২৭]

অতএব এর পর মহারাণা রাজসিংহ সম্বন্ধে টডের উক্তি—

'his dignified letter of remonstrance to Aurangzeb on the promulgation of the Capitation edict, places him high in the scale of moral as well as intellectual excellenee ;'[২৮]

—অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়। টড ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজসিংহের বিরোধের অন্যতম কারণরূপে জিজিয়াকর সম্পর্কিত তাঁর প্রেরিত চিঠিটির উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমও 'রাজসিংহ' উপন্যাস রচনায় এই বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন লক্ষ্য করা যায়।

মোঘলের সঙ্গে রাজসিংহের বিরোধের অপর কারণ হিসাবে চঞ্চল কুমারীকে (রূপকুমারী) ঔরঙ্গজেবের বিবাহ করার অভিপ্রায়ের কথা বলেছেন টড বঙ্কিমচন্দ্রও এই অভিমত অবলম্বনেই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এই বিষয়েও কোন কোন ঐতিহাসিক সংশয় প্রকাশ করেন—

'রূপকুমারীকে ঔরঙ্গজেব বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে;'[২৯] এমন কি রূপকুমারীর সঙ্গে রাজসিংহের বিবাহের দীর্ঘকাল পরে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মহারাণার বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল বলে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।[৩০]

আচার্য যদুনাথ অবশ্য এবিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করে বিরোধের কারণরূপে উল্লেখ করেছেন ঔরঙ্গজেব কর্তৃক রাজস্থানে জিজিয়াকর প্রবর্তনের এবং 'রাজসিংহ' কর্তৃক নাবালক অজিতসিংহের পক্ষাবলম্বনকে[৩১]

টডের বর্ণনানুযায়ী শাহাজাদা আকবর রাজপুত্র সৈন্যদ্বারা অন্তরীণ হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের করুণায় মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আচার্য যদুনাথ চিতোরে আকবরের শোচনীয় দুর্গতি ও বিপর্যয়ের বিষয়ে উল্লেখ করলেও জয়সিংহ কর্তৃক করুণা প্রদর্শন বিষয়ে কিছু বলেন নি। তবে শাহ আলম, মুজাম (আজম) ও আকবরের তিন দিক থেকে মেবার আক্রমণের বিষয় সমর্থন করেছেন যদুনাথ—

'The imperial plan henceforth was to penetrate the Mewar hills in three Columns—from the Chitor or eastern side Prince Aam would advance by way of the Deobari

pass and Udaipur, from the north Prince Muazzam by way of the lake Rajsamudra, and from the west Akbar through the Deosuri pass.'[৩২]

টড রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাসের চরিত্রটিকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, মোটামুটিভাবে আধুনিক কালের ঐতিহাসিক দ্বারা তা স্বীকৃত হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের আক্রোশ থেকে মৃত যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের জীবন রক্ষায় দুর্গাদাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ বিষয়ে টডের বক্তব্যের সমর্থন মেলে বর্তমান কালের ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের রচনায়—

'When Aurangzib demanded the surrender of the infant Ajit Singh and placed a guard round his house to prevent escape, Durgadas took counsel with his brother sardars and Quickly formed a plan for saving his infant master.'[৩৩]

কুমার অজিত সিংহকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও বহন করেছিলেন দুর্গাদাস। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আকবরকে আশ্রয়দানের ব্যাপারে দুর্গাদাসের যে উদারতার পরিচয় টড দান করেছেন, তার সমর্থনও মেলে যদুনাথের রচনায়—

'he volunteered to escort the luckless rebel Prince Akbar to the Maratha Court and thus saved him from the horrors of Aurangzib's Vengeance.'[৩৪]

তবে যশোবন্তের বিধবা মহিষীর যে বীরাঙ্গনা রূপ টডের বর্ণনায় পাওয়া যায়, যদুনাথকে সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করতে দেখা গেছে। অবশ্য যশোবন্তের মহিষী যে মেবারের রাজকুমারী ছিলেন, টড প্রদত্ত এই পরিচয় যদুনাথ কর্তৃক স্বীকৃত হতে দেখা গেছে এবং নাবালক অজিত সিংহকে তার বিধবা মাতার অনুরোধে রানা রাজসিংহের সমর্থন জ্ঞাপনের বিষয়টির অনুমোদনও যদুনাথের রচনায় মেলে।

পাদটীকা

১. 'রাজস্থান কাহিনী' ; ড. কালিকারঞ্জন কানুন গো ; পৃ: ১৯

২. Rise and Fall of the Mughal Empire ; Dr. R. P. Tripathi ; Page 219

৩. Ibid Tripathi ; Page 219

৪. 'কিন্তু এ অমর সিংহ মহারাণা প্রতাপের পুত্র নহেন,—শ্যালক ইডরের রাও নারায়ণ দাস রাঠোরের উত্তরাধিকারী'।

রাজস্থান কাহিনী, ড. কালিকারঞ্জন কানুন গো ; পৃ: ১১

৫. Rise and Fall of the Mughal Empire ; Dr. R. P. Tripathi ; Page 220

৬. রাজস্থান কাহিনী ; ড. কালিকারঞ্জন কানুন গো ; পৃ: ২২

৭. ঐ ঐ পৃ: ২২

৮. Akbar the Great Mogul ; Vincent A Smith ; Page 149

৯. Rise and Fall of the Mughal Empire ; Dr. R. P. Tripathi , Page 222

১০. Annals and Antiquities of Rajasthan , James Tod ; Chap XI ; Page 274

১১. Akbar the Great Mogul ; Vincent A smith ; Page 152

১২. Annals and Antiquities of Rajasthan , James Tod ; Chap XI Page 275

১৩ Ibid ; Chap XI ; Page 276

১৪. রাজস্থান কাহিনী ; ড. কালিকারঞ্জন কানুন গো ; পৃ: ২৬

১৫. ঐ ঐ পৃ: ২৭

১৬. Rise and Fall of the Mughal Empire ; Dr. R. P. Tripathi ; Page 226

১৭. Annals and Antiquities of Rajasthan ; James Tod ; Chap XI ; Page 277-278

১৮. Akbar the Great Mogul ; Vincent A Smith ; Page 96

১৯. History of Mediaval India ; Dr. Ishwari Prasad ; Page 226

২০. History of the Khaljis (Conquest of Chittor); Dr. K. S. Lal ; Page 129

২১. রাজপুতানেকা ইতিহাস ; ড. ওঝা ; (২য় খণ্ড), পৃঃ ৪৬১

২২. History of the Khaljis ; Dr. K. S. Lal ; Page 121

২৩. রাজস্থান কাহিনী ; ড. কালিকারঞ্জন কানুন গো ; পৃঃ ২৩৩

২৪. প্রবাসী (১৩৩৭ ; ফাল্গুন) পৃঃ ৬৫৩

২৫. ঐ

২৬ History of the Khaljis ; Dr. K. S. Lal ; Page 129-130

২৭. The Modern Review ; (January , 1908) ; Page 23

২৮. Annals and Antiquities of Rajasthan ; James Tod ; Vol I, Chap XIII ; Page 314

২৯. রাজস্থান কাহিনী ; ড. কালিকারঞ্জন কানুন গো ; পৃঃ ৬১

৩০. ঐ ঐ পৃঃ ৭৬

৩১. History of Aurangzib ; J. N. Sarkar ; Page 379

৩২. Ibid Page 379-393

৩৩. Ibid Page 375-376

৩৪. Ibid Page 375-376

তৃতীয় অধ্যায়

টডের 'রাজস্থান' ও বাঙ্গালা নাটক

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক নাটক কিংবা উপন্যাসের উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে মূলতঃ এর কারণ নিহিত ছিল তৎকালীন স্বাদেশিক চেতনায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সেদিন আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিজেদেরই প্রয়োজনে। প্রাচীন গ্রীস-রোমের ইতিহাস তাদের গৌরবময় কীর্তি গাথায় সমুজ্জ্বল। সেদিনের শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আমাদের দেশের অনুরূপ গৌরবময় ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের অনুসন্ধানে, উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন পরাধীন অবস্থার গ্লানিময় পরিবেশে অতীতের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী এবং চরিত্রের উপস্থাপনায় দেশবাসীর স্বাদেশিক চেতনাকে জাগ্রত এবং পরিপুষ্ট করতে। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায় সে যুগের অধিকাংশ লেখকের মানসিকতা লক্ষ্য করা যেতে পারে —

'হিন্দু মেলার পর হইতে আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।'[১]

প্রতিষ্ঠিত নাট্য সমালোচককেও মন্তব্য প্রকাশ করতে দেখা গেছে,—

'এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয়-ভাব-অনুপ্রাণিত নাট্যকারদের দ্বারা স্বদেশের গৌরবসূচক অতীত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নাটক প্রভৃতি লিখিত হয়। কাব্যে হেমচন্দ্র—নবীনচন্দ্র যেমন ভারতের জাতীয় সংগীত শুনাইলেন, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বন্দেমাতরম্-এর মন্ত্রে বাঙালীকে

দীক্ষিত করিয়াছিলেন, নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তেমনি গৌরবোজ্জ্বল অতীত বীরত্ব কাহিনী আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদর্শিত ধারা তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছিল।... জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় স্বদেশপ্রেমিক জনগণ তাঁহাদের বিগত ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত হইয়াছিলেন।'[২]

স্বদেশপ্রেম প্রচারের মাধ্যমরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন গ্রহণ করেছিলেন নাটকের আঙ্গিক, অনুরূপভাবে একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত তৎকালীন অধিকাংশ লেখকই নিজ নিজ প্রতিভা ও রুচিভেদে ভারতের প্রাচীন গৌরব গাথা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সহায়তা। কিন্তু সে সময়ে ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস তেমন সুলভ ছিল না। তাই পশ্চিম রাজস্থানের অন্তর্গত রাজ্যসমূহের তৎকালীন ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধি জেম্‌স্‌ টড প্রণীত '**Annals and Antiquities of Rajasthan**' সহজেই সেদিন ইতিহাস সচেতন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষতঃ আমাদের দেশের মধ্যযুগের ইতিহাস পরাধীনতার ইতিহাস। মধ্যযুগের পরাধীনতার এই গ্লানিময় অধ্যায়ে একমাত্র বীর রাজপুতগণই নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই সেদিন অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহে। সুতরাং 'রাজস্থানে'র বিষয়বস্তু অবলম্বনে গ্রন্থাদি রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন সেকালের ছোট বড় অনেক লেখকই। তন্মধ্যে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১১), রমেশ চন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫), রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪), দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩—১৯০৭), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫—১৯৩২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—

১৯১৩), ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪—১৯২৭), অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১), অতুল কৃষ্ণ মিত্র, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, গোপালক মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বসন্তকুমার মিত্র, কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর সঙ্গে তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজদের বিরোধকে 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত মুঘল-রাজপুত দ্বন্দ্বের রূপকে প্রকাশ করেন। এজন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ইতিহাসেও টড প্রণীত 'রাজস্থান' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য স্থান অনস্বীকার্য। তবে একথাও সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে, ইতিহাস মুখ্যতঃ সুলভ রোমান্স সৃষ্টির উপাদান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই স্বাদেশিক চেতনার উদ্বোধন ব্যতীত সুলভ রোমান্স সৃষ্টির উপাদান হিসাবেও 'রাজস্থানে'র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। টডের রচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থখানি যে যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়, তা বর্তমানে প্রমাণিত। কারণ, আজ আর অবিদিত নেই যে, টড তাঁর গ্রন্থে বহু অনৈতিহাসিক তথ্য এবং কিংবদন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে লেখকের নিজের গ্রন্থ সম্পর্কিত মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

'I should observe, that it never was my intention to treat the subject in the severe style of History, which would have excluded many details useful to the politician as well as to the curious Student. I offer this work as a copious collection of materials for the future historian; and as far less Concerned at the idea of giving too much, than at the apprehension of suppressing what might possibly be useful.'[৩]

সুতরাং 'রাজস্থান' গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব নিরূপণ বিষয়ে অধিকতর

প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। তবে যে সময়ে এই গ্রন্থটিকে উপন্যাস, কাব্য, নাটকাদির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, সে সময়ে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মর্যাদা ছিল অক্ষুণ্ণ। তথাপি 'রাজস্থানে' বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ সর্বত্র টডের যথাযথ অনুসরণ করেননি। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সর্বোপরি সাহিত্য। আর ইতিহাস ও সাহিত্য যেহেতু এক বস্তু নয়, সেইহেতু সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার না করে উপায় নেই। 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা, চরিত্র চিত্রণ প্রভৃতির ব্যাপারে লেখকেরা কম বেশি নিজেদের স্বাধীন কল্পনার স্বাক্ষর রেখেছেন।

'রাজস্থান' গ্রন্থের বিষয়বস্তু অবলম্বনে বাঙ্গালায় রচিত প্রথম নাটক মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। বেলগাছিয়া নাট্যশালার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজপুতদের ইতিহাস অবলম্বনে নাটক রচনা করতে—

'রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থ রচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।'

এইজন্যই মধুসূদন রাজপুত জাতির কাহিনী অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন।

মধুসূদন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন টড প্রণীত 'রাজস্থান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত সপ্তদশ অধ্যায় থেকে। স্বয়ং নাট্যকারের ভাষায়,,

'This plot is taken from Tod, Vol-I, P—461'

তবে প্রয়োজন বোধে নাট্যকার অপরাপর অধ্যায় থেকেও কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে যথাসময়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রাজকুমারী কৃষ্ণার পাণিগ্রহণে জয়পুরের মহারাজা জগৎসিংহ এবং অম্বরাধিপতি মানসিংহ ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার উভয়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন একাধিক অধিপতি-মহারাষ্ট্রের অধিপতি, যবনপতি আমীর, ধনকুলসিংহ প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণা স্বয়ং মৃত্যুবরণ করে সকল প্রকার বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন। টড তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—

'Kishna Komari (the virgin Kishna) was the name of the lovely object, the rivalry for whose hand assembled under the banners of her suitors, (Juggut Sing of Jeypur and Raja Maun of Marwar) not only their native chivalry, but all the predatory powers in India; and who like Helen of old, involved in destruction of her own and the rival houses.'[8]

কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে জগৎসিংহ এবং রাজা মানসিংহের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়, তার মূলে ছিল কৃষ্ণার অপরূপ সৌন্দর্য। নাটকে কৃষ্ণার সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। মদনিকা, জগৎসিংহের মন্ত্রী প্রত্যেকেই একবাক্যে কৃষ্ণার অপরূপ রূপ-লাবণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। টডের গ্রন্থেও কৃষ্ণার অপরূপ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বর্ণিত হতে দেখা গেছে—

'Kishna Komari Bae, the "Virgin Princess Kishna", was in her sixteenth year····· sprung from the noblest blood of Hind, she added beauty of face, and person to an engaging demeanour, and was justly proclaimed the "flower of Rajasthan."[৫]

নাটকে পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম জয়পুরের মহারাজা জগৎসিংহকে দুশ্চরিত্র, বিলাসী এবং দেহলোলুপ, কামুক চরিত্ররূপে

চিত্রিত করা হয়েছে। জগৎসিংহের সকলপ্রকার দুষ্কর্মের সঙ্গী ধনদাস, ভীমসিংহের মন্ত্রী সত্যদাস, রাজা মানসিংহের দূত এমন কি জগৎ-সিংহের অনুরাগিনী বিলাসবতীকেও জগৎসিংহের চরিত্র সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করতে দেখা গেছে। ফলে সহজেই এঁর রাজ্যের শোচনীয় অবস্থার কথা অনুমান করা যেতে পারে। যদিও এই শোচনীয় অবস্থা অপ্রাসঙ্গিক হেতু স্বাভাবিক কারণেই তা নাটকে বর্ণিত হয়নি। টডের 'রাজস্থানে' সেই শোচনীয় অবস্থা অবশ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে নাটকে জগৎসিংহের চরিত্রকে যেভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে টডের বর্ণনার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। এমনকি টডের গ্রন্থে জগৎসিংহের রক্ষিতারূপে বর্ণিত 'Ras-Caphoor' or 'Essence of Camphor'-কেই নাটকে বিলাসবতী চরিত্রে পরিণত হতে দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ডঃ ভট্টাচার্য 'বিলাসবতী' এবং 'জগৎসিংহ' চরিত্র চিত্রণ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে বিলাসবতী চরিত্রটি যেহেতু কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ বহির্ভূত, সেই হেতু চরিত্রটি ঐতিহাসিক মর্যাদা-লাভের পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু 'বিলাসবতী' নামটি নাট্যকার প্রদত্ত হলেও চরিত্রট যে টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত, তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আর কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ বহির্ভূত বলে চরিত্রটির ঐতিহাসিক মর্যাদাকে অস্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, কৃষ্ণকুমারীর অন্যতম পাণি-প্রার্থী জগৎসিংহেরই রক্ষিতা সে। সুতরাং চরিত্রটিকে নিতান্ত কাল্পনিক বলে অভিহিত করা চলে না। তবে নাট্যকার তাঁর কাহিনীটিকে জটিল করার অভিপ্রায়ে চরিত্রটিকে যে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন, তা অনস্বীকার্য। এবার জগৎসিংহ প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

সমালোচকের বর্ণনা অনুযায়ী,

'টডের রাজস্থানে জগৎসিংহ যোদ্ধা, রাজনৈতিক কূট-কৌশলে বিশেষ সিদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। কিন্তু মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে তিনি প্রেমিক, পতিতার প্রতি আসক্ত, এমন কি পতিতার পদধারণেও তাঁহার

বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই। এই জগৎসিংহ টডের জগৎসিংহ নহে। ইহা 'রত্নাবলী' কিংবা 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের বিদূষক সহচর রাজা চরিত্র। মধুসূদন রাজস্থান কাহিনীর বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে আনিয়া তাঁহাকে নারীর প্রেমচ্ছায়াতলে স্থাপন করিয়াছেন, ইহার ঐতিহাসিক মর্যাদা সেইজন্য রক্ষা পাইতে পারে নাই।' ৬

কিন্তু নাট্যকার—জগৎ সিংহ চরিত্রটিকে যে টডের বর্ণনানুসরণেই সৃষ্টি করেছেন, তার নিদর্শনস্বরূপ টডের গ্রন্থ থেকে প্রামাণিক অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে।

'Juggut Sing succeeded in A. D. 1803, and ruled for Seventeen Years, with the disgraceful distinction of being the most dissolute Prince of his race or of his age. The events with which his reign is crowded, would fill volumes were they worthy of being recorded.'৭

'...Sometime the daily journals (akbars) disseminated the scandal of the rawula (female apartments), the follies of the libertine Prince with his Concubine Ras-Caphoor (Essence of Camphor), or even less worthy objects, who excluded from the nuptial Couch his lawful mates of the noble blood of Joda, or Jessa, the Rahtores and Bhattis of the desert.' ৮

'The feodal chiefs held both his authority and his person in utter Contempt, and the pranks he played with the "Essence of camphor" (Ras—caphoor), at one time led to serious thoughts of deposing him; which project, when near maturity, was defeated by transferring "this queen of half of Amber", to the prison of Nahrgurh. In the height of his passionfor this Islamite Concubine, he formally installed her as queen of half his dominions, and actually Conveyed to her in gift a moiety personality of the crown, even to the invaluable library of the illustrious Jey Sing, which

was despoiled, and its treasures distributed amongst her base relations. The Raja even struck coin in her name, and not only rode with her on the same elephant, but demanded from his Chieftains those forms of reverence towards her, which were paid only to his legitimate queens. This their pride could not brook, and though the Dewan. or Prime Minister, Misr Sheonarain, albeit a Brahmin, called her "daughter", the brave Chand Sing of Doonee indignantly refused to take part in any ceremony at which she was present'.[৯]

নাটকে বর্ণিত হয়েছে অনন্যোপায় রাজা ভীমসিংহ শেষ পর্যন্ত রাজ্যের স্বার্থে কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আর এই হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভীমসিংহের ভ্রাতা এবং উদয়পুরের সেনাপতি বলেন্দ্র সিংহের ওপর। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলেন্দ্র এই সুকঠিন দায়িত্ব পালনে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায় যে প্রথমে রাজা ভীমসিংহ তাঁর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দৌলৎ সিং-এর ওপর কৃষ্ণা-হত্যার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন—

'Maharaja Dowlut Sing, descended four generations ago from one Common ancestor with the Rana, was first sounded "to save the honour of Oodipurl, but horror struck, he "exclaimed, accused the tongue that Commands it".[১০]

দৌলৎ সিং কৃষ্ণা হত্যায় অস্বীকৃত হলে তখন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মহারাজা জোয়ান দাসের ওপর।

'The Maharaja Jowandas, a natural brother was then Called upon; the dire necessity was explained, and it was urged that no common hand could be armed for the purpose.'[১১]

নাটকে এই জোয়ান দাসই রূপান্তরিত হয়েছেন বলেন্দ্রসিংহে। অবশ্য নামের ব্যাপারে বৈসাদৃশ্য থাকলেও কৃষ্ণা-হত্যার ব্যাপারে উভয়ের আচরণ ও মানসিকতায় যথেষ্ট সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। দু'জনেই রাজকুমারীর প্রতি স্নেহাসক্ত। দু'জনেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণা-হত্যার দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।

নাটকে জগৎ সিংহের পক্ষ সমর্থনকারী ধনকুল সিংহের যে পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে টডের গ্রন্থেও তার সমর্থন মেলে। নাটকে বর্ণিত হয়েছে, ধনকুল সিংহ মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায় কেউ কেউ তাঁকে ভীমসিংহের পুত্র বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। টডও তাঁর গ্রন্থে মরণোত্তর জাতক ধনকুল সিংহের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলেছেন—

'His (Raja Maun) predecessor, Raja Bheem, left a widow pregnant; she concealed the circumstance, and when delivered, Contrived to Convey the Child in a basket to Sowie Sing of Pokurn. During two Years he kept the secret: he at length Conveyed the Marwar Chieftains, with whose Concurrence he Communicated it to Raja Maun, demanding the Cession of Nagore and its dependencies as a domain for this infant, named Dhonkul Sing, the heir-apparent of Marwar'.[১২]

আর ধনকুলসিংহকে পুত্র বলে স্বীকার করতে স্বয়ং ভীমসিংহের বিধবা পত্নীও অস্বীকৃত হয়েছিলেন—

'She disclaimed the child.'[১৩]

তবে নাটকে যেখানে জগৎসিংহকেই মানসিংহের বিরুদ্ধে ধনকুলসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা গেছে, টডের বর্ণনায় সেক্ষেত্রে ধনকুলসিংহের পক্ষকেই যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়াসী দেখান হয়েছে। নাটকের

ঘটনানুযায়ী যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে জগৎসিংহকেই প্রয়াসী করে নাট্যকার নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকীয় বিচারে এই পরিবর্তন উপযুক্ত, যুক্তিসম্মত ও শিল্পগুণমণ্ডিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

কৃষ্ণার চরিত্রাঙ্কনেও নাট্যকার টডেরই অনুসরণ করেছেন। এমন কি হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বিচলিত ভীমসিংহের উন্মত্তবৎ আচরণ, খুল্লতাত বলেন্দ্রসিংহের নিকট জীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণার দার্শনিকসুলভ উক্তি এবং বৃহত্তর কারণে আত্মবিসর্জনের পারিবারিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে তার সচেতনতার সমর্থনও টডের গ্রন্থে বর্তমান। অবশ্য টডের বর্ণনায় এরকম প্রসঙ্গ কৃষ্ণা তার মাতার কাছে প্রকাশ করেছেন।

'why afflict Yourself, my mother, at this shortening of the sorrows of life ? I fear not to. die ! Am I not your daughter ? why should I fear death ? we are marked out for sacrifice from our birth ; we scarcely enter the world but to be sent out again'.[১৪]

অপরপক্ষে নাটকে কৃষ্ণাকে তার খুল্লতাতের কাছে এই ধরণের বক্তব্য প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

নাটকে মধুসূদন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছেন রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যুর ঘটনাটিতে। নাটকে কৃষ্ণকুমারীকে স্বহস্তে খড়গাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু টডের গ্রন্থে কৃষ্ণার বিষপানে (ঘুমের ঔষধ) মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাও একাধিকবার সেবনের ফলে। কৃষ্ণার মৃত্যুর দৃশ্যটিকে অধিকতর নাটকীয় করার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার এরূপ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন বোঝা যায়। কারণ বিষপানে মৃত্যু অপেক্ষা খড়গাঘাতে মৃত্যুর দৃশ্য Stage effects সৃষ্টিতে অধিকতর ফলপ্রসূ। নাটকের এই দৃশ্য তথা সমগ্র পঞ্চমাঙ্ক সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের নিকট প্রকাশিত মধুসূদনের অভিমতটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় –

'I flatter myself you will like the Fifth Act. I shed tears when poor Kissen Kumari Stabbed herself and fell on her bed'.

মধুসূদনের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে নাটকের দর্শকেরাও খড়গাঘাতে মৃত্যুবরণের জন্যই হতভাগিনী কৃষ্ণার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁর মতই অশ্রুবিসর্জন করবে।

নাটকে বর্ণিত রাজমহিষী 'অহল্যার' চরিত্রটিকে কোন সমালোচক[১৫] অনৈতিহাসিক চরিত্ররূপে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'অহল্যা' নামটি মধুসূদনের আরোপিত হলেও চরিত্রটি টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। নাটকে বর্ণিত অহল্যার আচরণের সঙ্গে টডের গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণার জননীর গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণার মৃত্যুর পর হতভাগিনী জননী অহল্যা কন্যার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন, টডের গ্রন্থেও তার সমর্থন মেলে—

'The Shrieks of the frantic mother reverberated through the palace, as she implored mercy, or execrated the murderers of her Child, who alone was resigned to her fate'.[১৬]

নাটকে কৃষ্ণার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজমহিষী অহল্যার মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে। টডের গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে—

'The wretched mother did not long survive her child; nature was exhausted in the ravings of despair; she refused food; and her remains in a few days followed those of her daughter to the funeral pyre'.[১৭]

তবে টডের বর্ণনার তুলনায় নাটকে অহল্যা চরিত্রটিকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে নিঃসন্দেহে।

পরিশেষে বলতে হয় যে রানা ভীমসিংহ কিংবা রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের দু'একটি বিক্ষিপ্ত উক্তিতে দেশপ্রেমের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অভিব্যক্ত, হলেও, রঙ্গলাল কিংবা পরবর্তীকালের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,

দ্বিজেন্দ্রলালের মত স্বদেশপ্রেম প্রচারের মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি রচনা করেন নি। মধুসূদনের স্বল্প পরিসর সাহিত্যিক জীবন সাহিত্য সৃষ্টির নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষায় অতিবাহিত। 'রাজস্থান' গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটকটিও তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন রূপে গৃহীত হবার যোগ্য।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দরহো' (১২৮৮)। বলাবাহুল্য টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র রচিত এটি প্রথম এবং বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক রচনার ইতিহাসে দ্বিতীয় নাটক। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট। এটি প্রথম অভিনীত হয় ন্যাশনাল থিয়েটারে ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ছিল মূলতঃ পৌরাণিক নাটক রচনার উপযোগী। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি পরবর্তীকালে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর নাটকে তাঁর তথ্যানুগত্যের উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু 'আনন্দরহো' নাটকটি গিরিশ প্রতিভার কোন স্বাক্ষরই বহন করে না। নাটকটি গিরিশচন্দ্রের নিতান্ত অক্ষম রচনা। নাট্যকারের বক্তব্য নাটকটিতে তেমন পরিস্ফুট হয়নি। নাটকের পাত্র-পাত্রীরাও তেমন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেনি। 'ভারতী' পত্রিকায় এই নাটক সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য ঃ

'গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই', বাস্তবিক অস্বীকার করা যায় না।

গিরিশচন্দ্র তাঁর এই নাটকটিতে টডের 'রাজস্থানে'র বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও পরিমাণে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। 'আনন্দরহো' নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের আচরণে সম্রাট শঙ্কিত এবং ক্ষুব্ধ। বিশেষত সম্রাটের উত্তরাধিকারী সেলিমের পরিবর্তে সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের

ব্যাপারে রাজা মানসিংহের ষড়যন্ত্র আকবর ছলে, বলে, কৌশলে ব্যর্থ করে দিতে কৃতসঙ্কল্প। শেষ পর্যন্ত বিষ প্রয়োগে মানসিংহের প্রাণ-হরণে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। কিন্তু সম্রাটের এই চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং নিজেই নিজের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছেন। এছাড়াও নাটকটিতে মানসিংহের কন্যা লহনার প্রেম, রানা প্রতাপের কাছে আকবরের সন্ধির প্রস্তাব,রানাপ্রতাপের মৃত্যুবরণ ইত্যাদি বিষয়ও স্থান পেয়েছে।

সম্রাট আকবর কর্তৃক বিষপ্রয়োগে মানসিংহকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যাপারটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক হলেও তা নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত নয়।[১৮] 'রাজস্থান' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে:

'A desire to be rid of the great Raja Maun of Amber, to whom he was so much indebted, made the emperor descend to act the part of the assassin. He prepared a majoom, or Confection, a part of which Contained poison ; but Caught in his own snare, he presented the innoxious portion to the Rajpoot and ate that drugged with death himself'.[১৯]

টড এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে আরও বলেছেন—

'we have a sufficient clue to the motives which influenced Akber to a deed so unworthy of him, and which were more fully developed in the reign of his successor ; namely, a design on the part of Raja Maun to alter the succession, and that Khoosru, his nephew, should succeed instead of Selim'.[২০]

সম্রাট আকবর মহারাণা প্রতাপের কাছে সৌহার্দ্র যাচ্ঞা করে পত্র প্রেরণকরলে প্রখর আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন প্রতাপের কাছে তা অক্ষমের নিকট বলবানের কৃপা প্রদর্শন তথা অপমান বলে অনুভূত হয়েছে। বিশেষত তাঁর সভাসদ্‌গণ এ ব্যাপারে প্রতাপের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে আকবরের আবেদনে সাড়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় প্রতাপ ক্ষোভে দুঃখে শয্যাশায়ী হয়েছেন। 'রাজস্থান' গ্রন্থে প্রতাপের আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

'......but for the high-minded, the generous Rajpoot, to be the object of that sickly sentiment, pity, wos more oppressive than the arms of his foe'.[২১]

ব্যথিত প্রতাপকে নাটকে তাঁর মন্ত্রী ভামসার বিরুদ্ধে অনুযোগ করতে দেখা গেছে—

'মন্ত্রি! তোমার মনে এই ছিল! আমি তো হলদিঘাটের পর অর্থহীন দীন হয়েছিলেম, কেন তুমি তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় রণ-রঙ্গে মাতালে ?

(দ্বিতীয় অঙ্ক ; চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ; পৃঃ২২৯)

মন্ত্রী ভামসা কর্তৃক প্রতাপকে অর্থ সাহায্যদানের বিষয়টি 'রাজস্থান' গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে—

'The minister of Pertap, whose ancestors had for ages held the office, placed at his Prince's disposal their accumulated wealth, which, with other resources, is stated to have been equivalent to the maintenance of twenty five thousand men for twelve years. The name of Bhama Sah is preserved as the saviour of Mewar'.[২২]

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র রচিত সাথক নাটক 'চণ্ড' ১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি চারঅঙ্ক বিশিষ্ট এবং 'রাজস্থানে'র সপ্তম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। টড অভিমত প্রকাশ করেছেন—

'If devotion to the fair sex be admitted as a criterion of civilization, the Rajpoot must rank high. His susceptibility is extreme, and fires at the slightest offence to female delicacy, which he never forgives'[২৩]

—উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনেই টড চিতোর রাজকুমার চণ্ডের কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন। রাঠোরের রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাবসহ ভাট নারকেল নিয়ে উপস্থিত হলে চিতোরের বৃদ্ধ রানা লাক্ষ রাজকুমারীকে নিয়ে পরিহাস করেন—

'The mess enger of Hymen was courteously rcceived by Lakha, wᵇo observed that chonda would soon return and tıke the gage ; "for", added he, drawing his fingers over his mustachios, 'I don't suppose you send such play things to an old greybeard like me.'[২৪]

—এই পরিহাসের জন্য রাজকুমার চণ্ড রাঠোর রাজকুমারীকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন। পিতা যে কন্যাকে নিয়ে পরিহাস করেন, কোনমতেই তিনি তাঁর বিবাহযোগ্যা হতে পারেন না, তিনি তাঁর মাতৃস্থানীয়া। অতঃপর বৃদ্ধ রানা স্বয়ং রাঠোর রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে বঞ্চিত করে নব-পরিণীতা স্ত্রীর পুত্রকে সিংহাসন দানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তদনুযায়ী বৃদ্ধ রানা লাক্ষ গয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে পঞ্চমবর্ষীয় বালক মুকুলকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে চণ্ড রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তারপর মুকুলের মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী চণ্ড নির্বাসিত হন এবং সেই সুযোগে রাঠোরাধিপতি সদলবলে চিতোরে উপস্থিত হয়ে ক্রমে চিতোরে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। অসহায় রাণী শেষপর্যন্ত চণ্ডেরই সহায়তায় রাঠোরদের কবল থেকে রক্ষা লাভ করেন। পুনরায় মুকুল চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

বলাবাহুল্য এ হেন কাহিনী নাটক রচনার উপাদান হিসাবে অতীব উপযুক্ত। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে কাহিনীটিকে উপযুক্তভাবেই ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজনমত তিনি স্বাধীন কল্পনার দ্বারা নাট্যকাহিনীটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। প্রথমতঃ লাক্ষরানার মহিষীর সখী বিজরীকে লাক্ষরানার মধ্যম

রাজকুমার রঘুদেবজীর প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ রণমল্ল কর্তৃক রঘুদেবের হত্যা এবং সেই সঙ্গে রণমল্লের পতনকে সংযুক্ত করে নাটকীয়তা সৃষ্টির বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন গিরিশচন্দ্র। অবশ্য নাটকে এতাদৃশ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় নিতান্তই সীমিত ক্ষেত্রে বর্তমান। নাটকটির আদ্যন্ত টডের কাহিনী অনুসারেই রচিত। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির প্রায় সব ক'টিই ঐতিহাসিক ; কয়েকটি ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নামকরণ করলেও ঐ চরিত্রগুলির উল্লেখ কিন্তু টডের গ্রন্থে বর্তমান। প্রসঙ্গত পূর্ণরায় ভাট, বিজরী, গুঞ্জমালা, কুশলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রাঠোর রাজকুমার 'যোদা' নাটকে 'যোধারাও' এবং রাঠোরাধিপতি 'রাওরিণমল্' 'রণমল্লে' রূপান্তরিত হয়েছেন। নাটকের মুখ্য চরিত্র চণ্ডের মহান ত্যাগ বীরত্ব এবং উদারতা টডের কাহিনী অনুসরণেই চিত্রিত। চণ্ডের মহান আত্মত্যাগ একমাত্র মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্রের সঙ্গে উপমিত হবার যোগ্য। নাটকে বর্ণিত হয়েছে—

গয়াধামে ধর্ম্মরণে লাক্ষরাণা যবে
করিল গমন, চণ্ডে দিতে সিংহাসন
বাঞ্ছা ছিল তাঁর, কেবা হতো প্রতিবাদী
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য-অধিকারী চিরদিন
কে করিত নিবারণ মুকুট গ্রহণ
চণ্ডের, কেমনে বা মুকুল পাইত
রাজ্যভার? উদার-স্বভাব মতিমান,
পিতারে প্রতিজ্ঞা হতে করিল উদ্ধার ;

টডও উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

'The Rana of cheetore journeyed to this b.urne, he was desirous to leave his throne unexposed to civil strife. The Subject of Succession had never been renewed ; but discussing with chonda his warlike pilgrimage Gya, from which

he might not return, he sounded him by asking what estates should be settled on Mukul. "The throne of cheetore", was the honest reply ; and to set suspicion at rest, he desired that the ceremony of installation should be performed previous to Lekh's departure. Chonda was the first to pay homage and swear obedience and fidelity to his future sovereign.' ২৫

চণ্ডের বিরল কর্তব্যপরায়ণতা এবং নির্লোভ আচরণের নিদর্শন একমাত্র রামায়ণের ভরত চরিত্রের সঙ্গে উপমিত হতে পারে। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে বালক রানা মুকুলের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে বিষয় নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজ্য শাসন এবং অনুজ রঘুদেবের প্রতি তার সুগভীর স্নেহ-প্রীতি বাস্তবিকই অতুলনীয়। চণ্ডের মাতৃভক্তির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাণী গুঞ্জমালা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ চণ্ডের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন, নানাভাবে তার ওপর নির্যাতন করে শেষ পর্যন্ত তাকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছেন। তথাপি এ হেন বিমাতা, রাণী গুঞ্জমালার প্রতি চণ্ডের কখনও বিরূপতা লক্ষ্য করা যায় না। অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বিমাতার আদেশই শুধু তিনি শিরোধার্য করেন নি, সেইসঙ্গে রাণীর আহ্বান মাত্র অসহায় বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার রক্ষাকল্পে সাড়া দিয়ে রাঠোরদের কবল থেকে চিতোর উদ্ধার করেছেন।

চণ্ডের বীরত্ব, দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তাও প্রশংসনীয়। রাণী গুঞ্জমালার নির্দেশে নির্বাসনকে শিরোধার্য করলেও অসহায় রানার ভাবী বিপদ সম্বন্ধে চণ্ড অবগত ছিলেন। তাই পূর্ব থেকেই তিনি চিতোরে বালক রানার জীবন রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এবং উপযুক্ত প্রয়োজনের সময় তা সার্থকভাবে কার্যকরীও হয়েছে। মিষ্টান্ন বিতরণ উৎসব চণ্ডের পরামর্শেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেওয়ালী উৎসবে যখন সমগ্র চিতোর রাজ্য আনন্দে মত্ত,

সেই সুযোগে চিতোরে উপস্থিত হয়ে রাঠোরদের আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। টডের গ্রন্থেও এই বিষয়টি বর্ণিত হতে দেখা গেছে—

'Chonda, though at a distance, was not inattentive amongst the Rajpoots. At his departure he was accompanied by two hundred Ahaireas or huntsmen, whose ancestors had served the princes of cheetore from ancient times. Tnese had left their families behind, a visit to whom was the pretext for their introduction to the fort. They were instructedto get into the service of the keepers of the gates, and being considered moreattached to the place than to the family, their object was effected. Tne Queen-mother was counselled to cause the young prince to descend daily with a numerous retinue to give feasts to the surrounding villages, and gradually to increase the distance, but not to fail on the "festival of lamps" to hold the feast of Gosoonda'. [২৬]

রাঠোরাধিপতি রণমল্লের রাজ্য তৃষ্ণা এবং কামুক চরিত্রের পরিচয়ও 'রাজস্থানে' বিদ্যমান। এমন কি রণমল্লের পতনের ক্ষেত্রেও নাট্যকার 'রাজস্থানে'র ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন।

রাণী গুঞ্জমালার ক্ষমতা লিপ্সা এবং চণ্ডের ওপর অন্যায় আক্রোশ-বশতঃ তার বিরুদ্ধে রাণীর প্রতিশোধমূলক আচরণের সমর্থনও 'রাজস্থানে' মেলে। লাক্ষরানার মধ্যম রাজকুমার রঘুদেবজীকে নাট্যকার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী রূপে চিত্রিত করেছেন। 'রাজস্থানে' অবশ্য রঘুদেবের নানা মহৎ গুণাবলীর কথা বর্ণিত হলেও তার সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয় উল্লিখিত হয়নি, উল্লিখিত হয়নি তার ঈশ্বর আরাধনার কথা। কেবলমাত্র বর্ণিত হয়েছে রঘুদেব রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে বনবাস করতেন। তবে রণমল্ল কর্তৃক রঘুদেবের উদ্দেশে বস্ত্রপ্রেরণ এবং

সেই বস্ত্র পরিধানের অবকাশে রঘুদেবকে হত্যা করার বিষয়টি 'রাজস্থানে' বর্তমান—

'Rao Rinmul sent a dress of honour, which etiquette requiring him to put on when presented, the prince (Raghudeva) was assassinated in the act.' [২৭]

চিতোরবাসীদের কাছে রঘুদেবের অসীম জনপ্রিয়তা বিশেষত তার হত্যার পর চিতোর বাসীদের মনে রঘুদেবের অমোঘ প্রভাবের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে 'রাজস্থানে' বলা হয়েছে—

'Raghudeva was so much beloved for his virtues, courage and manly beauty, that his murder became martyrdom, and obtained for him divine honours, and a place amongst the Dipairee (Pitri-deva) of Mewar. His image is on every hearth, and is daily worshipped with the penates.' [২৮]

নাটকেও এই ঘটনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। পরিশেষে গিরিশচন্দ্র তাঁর সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দ রহো' গদ্যে রচনা করলেও 'চণ্ড' নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন। অবশ্য তাই বলে নাটকটি আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়। পূর্ণরাম ভাট, মুকুল, সভাসদ্‌গণ, প্রজা প্রভৃতিদের সংলাপ গদ্যে রচিত। আবার রণমল্ল বিজরী, চণ্ড, গুঞ্জমালা প্রমুখাদির ক্ষেত্রেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যতীত মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে বাঙ্গালা সাহিত্যে যতগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে আবার 'রাজস্থানে'র অন্যতম আকর্ষণ রানা প্রতাপ সিংহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যাই সর্বাধিক। রাজপুত ইতিহাসে প্রতাপের ন্যায় বীর, স্বদেশপ্রেমিক অসীমকষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রানার চরিত্র তথা কাহিনী সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে থাকে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রও আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাজপুত

জাতির গৌরব, মহান রানা প্রতাপের চরিত্র এবং জীবন অবলম্বনে নাটক রচনায়। ১৩১০ বঙ্গাব্দের শেষভাগে গিরিশচন্দ্র 'রাণাপ্রতাপ' নাটক রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের কিয়দংশ (২য় অঙ্ক) রচনার পর নাটকটির রচনা বন্ধ রাখেন। এই অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত নাটকটি ১৩১৪ সালে 'অর্চনা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'আনন্দ রহো' নাটক রচনার সময়েই গিরিশচন্দ্র সম্ভবত রানা প্রতাপের চরিত্র ও কার্যাবলীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে রানা প্রতাপ অবলম্বনে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। নাটকের কিয়দংশ রচনার পর নাটকটিকে অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। অতঃপর নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' (১৯১৫) প্রকাশিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা আর বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। তবে গিরিশচন্দ্র 'রাণা প্রতাপ' নাটকটির আদ্যন্ত যে টডের অনুসরণেই রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা অসমাপ্ত নাটকের তথ্যাবলীর সঙ্গে 'রাজস্থান' গ্রন্থের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থেকেই সহজে অনুমিত হয়।

'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে যে চিতোরের পরাধীনতার জন্য মহারাণা প্রতাপ নাকি আদেশ দিয়েছিলেন—

'To Commemorate the desolation of cheetore, which the bardic historian represents as a 'widow' despoiled of the ornaments to her loveliness, Pertap interdicted to himself and his successors every article of luxury or pomp, until the insignia of her glory should be redeemed. The gold and silver dishes were laid aside for pateras of leaves; their beds henceforth of straw, and their beards left untouched. But inorder more distinctly to mark their fallen fortune and stimulate to its recovery, he commanded that the martial nakaras, which always sounded in the van of battle or processions, should follow in the rear.' [২১]

নাটকেও প্রতাপকে অনুরূপ নির্দেশাবলীর কথা বলতে দেখা গেছে :

মহাব্রতে ব্রতী ওহে বীরেন্দ্র সমাজ,
মহাব্রত উপযোগী নিয়ম পালন,
অদ্য হ'তে কর্তব্য সবার।
হে সর্দ্দার নিচয়,
চিতোর বৈধব্য—গান শুনিয়াছ ভট্ট-মুখে যবে ;
বিধবা চিতোর—
তবে কেন শোক-চিহ্ন না করি ধারণ।
যতদিন চিতোর না হইবে উদ্ধার,
মম পণ — শ্মশ্রু জটা করিব ধারণ,
অট্টালিকা-মাঝে —
স্থান নাহি আর শোকার্ত্ত রাণার —
বাসযোগ্য পল্লব — কুটীর ;
শোকার্ত্তের কাঞ্চন না হয় সুশোভন—
তৃণ সিংহাসন, তৃণ শয্যা,
ভোজ্য-পাত্র — বৃক্ষপত্র আজি হ'তে ;
অগ্নিবৎ অন্য ধাতু স্পর্শ করি জ্ঞান,
লৌহ স্পর্শে রব নিশিদিন
লৌহ সংস্পর্শ অশু'চর বিধি—
বিলাস-বর্জন মহাব্রত গ্রহণের প্রথম নিয়ম।
শত্রু হস্তে বিজিত চিতোর, —
অনুকূল জয়লক্ষ্মী নহে যতদিন,
অগ্রগামী নাহি হয় সংগ্রাম—দামামা,
দামামা বিলাপ নাদ করিবে পশ্চাতে।
(গিরিশ গ্রন্থাবলী ; ১০ম খণ্ড ; প্রথম অঙ্ক ; পৃঃ ২৪৮)

প্রতাপ আরও আদেশ দিয়েছিলেন—

নিম্নভূমি—অল্প সৈন্যে না হবে রক্ষিত
সে কারণ যুক্তি এই শুন —

বীরগ্রাম নিম্ন-স্থল করি পরিহার—
করি শিখর আশ্রয়—
পতিত রহুক নিম্নভূমি,—
কণ্টক-আকীর্ণ জনশূন্য নিম্নস্থলে
শত্রু যেন না পায় আশ্রয়।
হোক্ রাজ্য বনে পরিণত—
পদক্ষেপ তুর্কী নাহি করে কদাচিৎ।
(গিরিশ গ্রন্থাবলী ; ১০ম খণ্ড ; ১ম অঙ্ক ; পৃ: ২৪৯)

'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে—

'being unable to keep the field in the plains of mewar, he followed the system of his ancestors, and commanded his subjects, on pain of death, to retire into the mountains. During the protracted contest, the fertile tracts watered by the Bunas and the Beris, from the Aravali chain west to the eastern table-land, was be chiragh, 'without a lamp.' [৩০]

'The silence of the desert prevailed in the plains, grass had usurped the place of the waving corn ; the high ways were choked with the thorny babool, and beasts of prey made their abode in the habitations of his subjects,' [৩১]

রাজা মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপের বিরোধের সূত্রপাত হিসাবে নাটকে যে ঘটনার কথা বর্ণিত হয়েছে তাও টডের বর্ণনার অনুসরণেই। সোলাপুর যুদ্ধ বিজয়ের পর প্রত্যাবর্তনরত মানসিংহ স্বেচ্ছায় প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মানসিংহ যেহেতু আকবরের সঙ্গে তাঁর ভগ্নীর বিবাহ দিয়েছিলেন, তাই প্রতাপ তাঁর সঙ্গে ভোজন করতে অসম্মত হন, পরিণামে অপমানিত মানসিংহ অভুক্ত অবস্থায় আতিথ্য ত্যাগ করে চলে যান এবং আকবরের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতাপকে আক্রমণ করেন। এই কাহিনী নাট্যকার 'রাজস্থান' থেকেই লাভ করেছিলেন।

টড বর্ণনা করেছেন—

'Prince Selim, the heir of Delhi, led the war'[৩২]

নাটকেও সম্রাট আকবর সেলিমের উদ্দেশে বলেছেন:

'সেলিম, তোমার মন-সাধ পূর্ণ হবে। তুমি স্বয়ং মিবার জয় করো।'

(ঐ ; দ্বিতীয় অঙ্ক ; পৃঃ ২৫৫)

মহারাণা প্রতাপ একাধিক স্থানে যে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছেন:

আত্মীয় স্বজন তুর্কী-অর্থে প্রলোভিত-
করিয়াছে তুর্কীর দাসত্ব স্বীকার!
কেহ ভগ্নীদানে-তনয়া প্রদানে কেহ—
হইয়াছে আকবরের প্রসাদ ভাজন!

কিংবা,

বাপ্পারাও রাজধানী তুর্কী-করগত,
বাপ্পা বংশোদ্ভূত দুর্মতি সাগরজিউ
তুর্কীর কিঙ্কর আজি—
তুর্কী প্রতিনিধি-রূপে আজি চিতোর ঈশ্বর।

(ঐ ; প্রথম অঙ্ক ; পৃঃ ২৪৮)

এরও সমর্থন পাওয়া যায় টডের বর্ণনায়—

'The Princes of Marwar, Ambar, Bikaneer and even Boondi, late his firm ally, took part with Akber and upheld despotism. Nay, even his own brother, Sagarji, deserted him, and received, as the price of his treachery, the ancient capital of his race, and the title which that possession conferred'.[৩৩]

নাটকের প্রথম অঙ্কেই মেবারের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেটিরও মূলে রয়েছে টডের বিবরণ।

নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা এবং ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তনের মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষভাবে নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাস্তবিক,

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'কে অবলম্বন করে বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে শুভ সূচনা ঘটে এবং যে ধারা শেষ পর্যন্ত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভায় চরমোৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সেই ধারাটিকেই বিশেষভাবে পুষ্ট করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনের নাটকে দেশপ্রেমের যে অস্পষ্ট এবং অস্বচ্ছ ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে তা সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছরূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য মৌলিক নাটক রচনা অপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর-আক্রমণ নাটক'টি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর। নাটকটি 'উদাসিনী' প্রণেতা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়। নাটকটি আলাউদ্দীনের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত।

ভৈরবাচার্য নামধারী ছদ্মবেশী এক মুসলমান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মেবারের রানা লক্ষ্মণসিংহকে আলাউদ্দীনের হাত থেকে চিতোর রক্ষার শর্তস্বরূপ চতুর্ভুজা দেবীর নিকট তাঁর একমাত্র কন্যা সরোজিনীকে বলিদানের জন্য বলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে ভৈরবাচার্য রানার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দৈববাণীর ছলনা গ্রহণ করেছিলেন। চিতোর রক্ষার প্রয়োজনে প্রাণাধিক কন্যার জীবন বলিদানের ব্যাপারে লক্ষ্মণসিংহ মহা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন। শেষে রাজপুত সৈন্যদের প্রবল চাপে, সর্বোপরি ভৈরবাচার্য ও সেনাপতি গারাধিপতি রণধীরসিংহের প্রবল তাড়নায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানা তাঁর একমাত্র কন্যা সরোজিনীকে চতুর্ভুজার কাছে বলিদানে সম্মত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাধ সাধলেন লক্ষ্মণসিংহের ভাবী-জামাতা বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ। সরোজিনীকে বলিদানের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে নাটকীয়ভাবে বিজয়সিংহের হস্তক্ষেপে সরোজিনীর জীবন রক্ষা পায় এবং ঘটনাচক্রে ভৈরবাচার্যের চক্রান্তের ফলে তাঁর কন্যা রোশেনারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থানুযায়ী ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন

চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোর রক্ষার্থে রাজপুত বীরগণ আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সকল প্রয়াসই হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। শেষে সরোজিনীসহ সকল রাজপুত রমণী কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে জীবন বিসর্জন করেন। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

আলোচ্য নাটকটির পটভূমি ঐতিহাসিক হলেও নাটকে বর্ণিত মূল ঘটনা অনৈতিহাসিক এবং নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অপরূপ রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ, চিতোর দুর্গের পতনে রাজপুত রমণীদের কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে আত্মবিসর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলি 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে সত্য। এমন কি রানা লক্ষ্মণসিংহের দৈববাণী শ্রবণের বিষয়টিও 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে। তবে 'রাজস্থানে' চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তৃপ্তিবিধানে রানার দ্বাদশটি পুত্রের আত্মবলিদানের নির্দেশই উল্লিখিত হয়েছে—

'The Rana, after an arduous day, stretched on his pallet, and during a night of watchful anxiety, pondering on the means by which he might preserve from the general destruction one at least of his twelve sons; when a voice broke on his solitude, exclaiming "Myn bhooka ho'," and raising his eyes, he saw, by the dim glare of the cheragh (lamp), advancing between the granite columns, the majestic form of the guardian goddess of cheetore. "Not satisfied," exclaimed the Rana, "though eight thousand of my kin were late an offering to "thee"?—"I must have legal victims; and if twelve who "wear the diadem bleed not for cheetore, the land will pass from the line." This said, she vanished.' ৩৪

নাট্যকার নাটকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে চতুর্ভুজাকে অভিহিত করেছেন। এবং 'রাজস্থানে' বর্ণিত দেবীর নির্দেশদানকে

নাটকে ভৈরবাচার্যরূপী মহম্মদ আলির ষড়যন্ত্র বলে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি নাটকের মুখ্য বিষয়—সরোজিনীর বলিদান প্রসঙ্গটিও নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। সরোজিনীর বলিদানকে কেন্দ্র করে রানা লক্ষ্মণসিংহের যে মানসিকদ্বন্দ্ব, তা সঙ্গত কারণেই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কৃষ্ণকুমারীর হত্যার ব্যাপারে রানা ভীমসিংহের দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' খ্যাত রঘুপতির চরিত্রের সঙ্গে ভৈরবাচার্যের গভীরতর সাদৃশ্যেরও উল্লেখ করতে হয়। সর্বোপরি অনেকের মতেই 'সরোজিনী' নাটকটিতে ইউরিপিডিসের **'Iphigenia at Aulis'** নাটকটির প্রভাব বিদ্যমান।[৩৫]

গতি, দ্বন্দ্ব প্রভৃতির বিচারে 'সরোজিনী' নাটকটির অসাধারণ নাটকীয়তা অনস্বীকার্য হলেও, ঐতিহাসিকত্বের বিচারে নাটকটির দাবী তেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলা চলে।

'অশ্রুমতী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং উল্লেখযোগ্য, নাটকটি বিলাত প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত।

'অশ্রুমতী' নাটকটি আপাতদৃষ্টিতে রাজপুতগৌরব মহারাণা প্রতাপ সিংহের কাহিনীকেন্দ্রিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতাপ-কন্যা অশ্রুমতী এবং আকবর-তনয় যুবরাজ সেলিমের অনৈতিহাসিক প্রণয়-কাহিনীর নাট্যরূপ। তবে মহারাণা প্রতাপসিংহ বিষয়ে নাটকে যা বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে নাট্যকার টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত তথ্যাদির প্রতি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য দেখিয়েছেন লক্ষ্য করা যায়।[৩৬]

নাটকের সূচনাপত্রে নাট্যকার 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

'There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap—some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermophylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon'

—এই উক্তি থেকেই নাট্যকারের প্রতাপ-অনুরক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকারও স্বয়ং 'অশ্রুমতী' নাটক রচনার অভিপ্রায় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

'মহারাণা প্রতাপসিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি স্বীকার করি 'অশ্রুমতি' বলিয়া প্রতাপসিংহের কোনো কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনা-মাত্র। আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে তাহাতে প্রতাপসিংহের চরিত্র-গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।'[৩৮]

এইবার নাট্য-বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রানা প্রতাপসিংহ কর্তৃক অপমানিত মানসিংহ প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতীকে অপহরণ করান। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সেনাপতি ফরিদ খাঁর সঙ্গে অশ্রুমতীর বিবাহ দিয়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেলিম অশ্রুমতীকে উদ্ধার করেন এবং অশ্রুমতী ও সেলিম পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ফরিদ খাঁর হাতে পৃথ্বীরাজ শোচনীয়ভাবে নিহত হওয়ায় শক্তসিংহের মনোবাঞ্ছা বাস্তবে পরিণত হতে পারে না। শক্তসিংহ অতঃপর সেলিমের ছুরিকাঘাতে আহত অশ্রুমতীকে মুঘলদের কবল থেকে মুক্ত করে মৃত্যুশয্যায় শায়িত প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন। প্রতাপ প্রথমে অশ্রুমতীকে কুলকলঙ্কিনীজ্ঞানে বিষপানে প্রাণত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরিশেষে শক্তসিংহের নিকট থেকে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে তিনি অশ্রুমতীকে চিরকুমারী যোগিনীর ব্রত অবলম্বনের নির্দেশ দান করে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপ বিষয়ক বর্ণনাদির ব্যাপারে এবং অপরাপর নানাবিধ ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনায় নাট্যকার টডের প্রতি আনুগত্য দেখালেও, এমন কি নাটকের অনেক স্থলে টডের বর্ণনার হুবহু অনুবাদ লক্ষ্য করা গেলেও, বিশেষ করে প্রতাপসিংহের কন্যা বলে বর্ণিত অশ্রুমতী ও তার সখী মলিনা—উভয় চরিত্রই নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত তা উল্লেখ করতে হয়। শুধু মাত্র তাই নয়, উভয়ের প্রেমকাহিনীও নাট্যকারের স্বাধীন সংযোজন। উল্লেখযোগ্য আলোচ্য নাটকটির অধিকাংশ স্থান এই প্রেমকাহিনীই অধিকার করে আছে।

সোলাপুর যুদ্ধ জয়ের পর প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং মহারাণা প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মানসিংহের ভোজনের সময় প্রতাপের স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতিই শেষ পর্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে মানসিংহের বিরোধের কারণ রূপে দেখা দেয়। নাটকে বর্ণিত এই ঘটনা টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। এমন কি নাটকের পঞ্চমাঙ্কে মৃত্যু-পথযাত্রী প্রতাপের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তাও 'রাজস্থান' গ্রন্থাবলম্বনেই। মৃত্যুকালে প্রতাপ তাঁর মানসিক উদ্বেগের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র অমরসিংহের একদিনের আচরণের উল্লেখ করেন।-- প্রতাপ যখন মুঘলের বিরুদ্ধে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন, শুধুমাত্র ঝড়-বৃষ্টির থেকে আত্মরক্ষার্থে পেশলা নদী তীরে কয়েকটি কুটীর নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে একদিন তাঁর পুত্র অমরসিংহ কুটীরের নিম্নতা বিস্মৃত হয়ে মাথা অবনত না করে প্রবেশ করতে গেলে কুটীরের ছাদের বাঁশে বেঁধে তার পাগড়ীটা যায় খুলে। এতে অমরসিংহের মুখমণ্ডলে যে বিরক্তির ভাব সূচিত হয় তা থেকেই প্রতাপের ধারণা হয় যে অমরসিংহের বিলাসিতা এবং আড়ম্বরপ্রিয়তাই শেষপর্যন্ত মেবারের স্বাধীনতা লক্ষ্মীর বিসর্জনের পথকে করবে প্রশস্ত।— এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে টড বলেছেন:

'On the banks of Peshola, Pertap and his chiefs had constructed a few huts, to protect them during the inclemency of the rains in the day of their distress. Prince Umra, forgetting the lowliness of the dwelling, a projecting bamboo of the roof caught the folds of his turban and dragged it off as he retired. A hasty emotion, which disclosed a varied feeling, was observed with pain by pertap, who thence adopted the opinion that his son would never withstand the hardships necessary to be endured in such a cause.' ৩৯

পরাজিত প্রতাপের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার যে হৃদয় বিদারক চিত্র নাটকে বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠকের মনকে সহজে আর্দ্র করে তোলে। এমনদিনও তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে যেদিন তাঁর সন্তানের মুখের গ্রাস ঘাসের দানার তৈরী সামান্য রুটি বনবিড়ালে নিয়ে যাওয়ায় কঠিন হৃদয়ের অধিকারী অসহায় প্রতাপও চোখের জল না ফেলে পারেন নি। টডের গ্রন্থেও অনুরূপ হৃদয়বিদারক ঘটনার সমর্থন মেলে—

'On one occasion his queen and his son's wife were preparing a few cakes from the flour of the meadow grass, of which one was given to each ; half for the present, the rest for a future meal. Pertap was stretched beside them pondering on his misfortunes, when a piercing cry from his daughter roused him from reflection, a wild cat had darted on the reserved portion of food, and the agony of hunger made her shrieks insupportable······

He had beheld his sons and his kindred fall around him on the field without emotion "for this the Rajpoot was born ;

but the lamentation of his children for food "Unmanned him." ৪০

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতাপের যোগ্য মন্ত্রী ভামশার চারিত্রিক ঔদার্য, দেশপ্রেম তথা প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রেও 'রাজস্থান' গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন। অর্থাভাবে যখন প্রতাপ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন, তখন তাঁর সেই দুরবস্থার সময় ২৫০০০ সৈন্যের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থ ভামশা প্রতাপকে প্রদান করেছিলেন। এ তথ্য নাট্যকার টডের গ্রন্থ থেকেই নিয়েছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের বর্ণনায়ও নাট্যকারকে টডের বর্ণনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করতে দেখা গেছে। ঝালাপতি মান্নার অদ্বিতীয় প্রভুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রতাপের রাজছত্র স্বীয় মস্তকে ধারণ-পূর্বক প্রতাপ-শত্রু মানসিংহের হাতে মৃত্যু-বরণের বৃত্তান্তটি 'রাজস্থান' গ্রন্থেরই বর্ণিত বিষয়।

নাটকে সম্রাট আকবর-তনয় সেলিমকে উদার প্রকৃতির ও সত্যানুরাগী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতাপের ভাই আকবরের পক্ষাবলম্বী শক্তসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে নিঃসঙ্গ প্রতাপের অনুসরণকারী দু'জন মুঘল সৈন্যকে হত্যা করে প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। শক্তসিংহ সেলিমের কাছে উপরোক্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করলে সেলিম তাকে মার্জনা করেছিলেন। টড এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

'On rejoining Selim, the truth of Sukta was greatly doubted when he related that Pertap had not only slaim his pursuers, but his own steed, which obliged him to return on that of the khorasani, Prince Selim pledged his word to pardon him if he related the truth; when Sukta replied, "the burthen of a kingdom is on my brother's shoulders, nor could I witness his danger without defending from it." Selim kept his word…' ৪১

টডের বর্ণনানুযায়ী,

'Sukta, whose personal enmity to Pertap had made him a traitor to Mewar'.[৪২]

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকে প্রতাপের বিরুদ্ধে তাঁর ভ্রাতা শক্তসিংহের শত্রুতার বিষয়ে উল্লেখ প্রসঙ্গে 'আহিরিয়া' উৎসব উপলক্ষে দুই ভ্রাতার বরাহ শিকারে গমন এবং একটি বরাহ শিকারকে কেন্দ্র করেই উভয়ের মধ্যেকার শত্রুতার উদ্ভব বলে বর্ণনা করেছেন। টডের বর্ণিত 'আহিরিয়া' উৎসবের তাৎপর্য স্মরণে রেখেই নাট্যকার বরাহ শিকার প্রসঙ্গে প্রতাপের সঙ্গে শক্তসিংহের বিবাদের চিত্রটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন।[৪৩] বলাবাহুল্য, যেহেতু ঐদিনের শিকারের সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের শুভাশুভের প্রশ্ন জড়িত, সেইজন্যই বরাহ হত্যার ব্যাপারে নাটকে শক্তসিংহ ও প্রতাপসিংহ—উভয়কে স্বীয় স্বীয় দাবীতে অটল থাকতে দেখা গেছে।

বিকানীর রাজকুমার পৃথ্বীরাজের চরিত্রটিও নাট্যকার টডের অনুসরণেই অঙ্কিত করেছেন লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার পৃথ্বীরাজকে একই সঙ্গে বীর এবং একজন প্রসিদ্ধ কবিরূপে চিত্রিত করেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের একস্থানে পৃথ্বীরাজকে বলতে দেখা গেছে—

"—আমার রাজ্য গেছে, সব গেছে, আমি আর প্রতাপকে কি করে সাহায্য করব—আমার এখন এক কবিতা মাত্র সম্বল, মাঝে মাঝে আমি গোপনে তাঁকে কবিতা লিখে উৎসাহিত করবার জন্য চেষ্টা করি এই মাত্র—"।

টডও তাঁর বর্ণনায় বলেছেন :

'Prithwiraj was one of the most gallant chieftains of the age, and like the Troubadour princes of the west, could grace a cause with the soul-inspiring effusions of the muse, as well as aid it with his sword'[৪৪]

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে পৃথ্বীরাজের যে পত্রকবিতাটি সংযোজিত হয়েছে—

হিন্দুর ভরসা-আশা হিন্দুর উপর।
সে আশারো পরে রাণা ছেড়েছে নির্ভর।
প্রতাপ ছিলে গো ভাগ্যি—নচেৎ আকবর
করেছিল সমভূমি—সব একাকার।
ক্ষত্রিয় বীরের আর কোথা সে বিক্রম ?
মহিলারো কোথা এবে সতীত্ব সম্ভ্রম ?
যথার্থ সে রাজপুত—"নয় রোজা" দিনে
বিসর্জ্জিতে পারে কি গো আপন সম্ভ্রমে ?
কিন্তু বল কয়জন করেনি বিক্রয়,
সেই সে অমূল্য-ধন খেয়ে লজ্জা ভয় ?
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য-ধন বেচিল ক্ষত্রিয়
বিকাবে সে রত্ন কি গো চিতোর ভূমিও ?

* * *

বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে "কোন্ গুপ্ত বলে
এড়ালেন মহারাণা শক্রর কৌশলে ?"
নাহি প্রতাপের-শোনো-অন্য কোন বল,
হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল। ইত্যাদি।

—তারও মূলে রয়েছে টড কৃত পৃথ্বীরাজ রচিত একটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ :

'The hopes of the Hin u rest on the Hindu ; Yet the Rana forsakes them. Buc for Pertap, all would be placed on the same level by Akbzr ; for our chiefs have lost their valour and our females their honour. Akber is the broker in the market of our race : all has he purchased but the son of Oodoh ; he is beyond his price. What true Rajpoot would part with honour for nine days (Noroza) Yet how many have bartered it away ? will cheetore come to this

market, when all have disposed of the chief article of the khetri··· ? Despair has driven many to this mart, to witness their dishonour: from such infamy the descendant of Hamir alone has been preserved. The world asks, whence the concealed aid of Pertap ? None but the soul of manliness and his sword : with it, well has he maintained the khetri's pride.' etc.[৪৫]

অতএব এরপর নাটকটির ঐতিহাসিকত্ব বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য, 'একে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, পাত্রপাত্রীর নাম ইতিহাস থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু নাট্যোল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ কম"[৪৬] যথার্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে বিশেষ ধারার সূত্রপাত ঘটে, তা সার্থক পরিণতি লাভ করে দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের ন্যায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে টড প্রণীত 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়কে অবলম্বন করেছিলেন। টডের গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে সর্বাধিক নাটক রচনার কৃতিত্ব একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেরই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে ক্ষীরোদ প্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারগণের মধ্যে ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুসরণ একমাত্র গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়ে থাকে। তারপরই উল্লেখ করতে হয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাম। দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য, 'কি ঘটনা বিন্যাসে কি নামকরণে কি সংলাপে কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখেন নাই'—[৪৭] সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। একথা ঠিক যে, তাঁর নাটকে কল্পনার স্থান নেহাৎ কম নয়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

নাটকে তুলনামূলক বিচারে ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনার স্থান যেমন অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তেমনটি লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন এবং যেখানে ইতিহাসকার নীরব, কেবলমাত্র সেইখানে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি কাল্পনিক ঘটনা অথবা চরিত্রের সংযোজন করেছেন।[৪৮]

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' (১৯০৩)। টড প্রণীত 'রাজস্থান' অবলম্বনে নাট্যকার রচিত এটি প্রথম নাটক। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, 'এই নাটকের উপাদান টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণ কবি দ্বারা রাজপুতদিগের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এ মহিমময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই।'

—এইজন্যই নাট্যকার স্বয়ং পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী অবলম্বনে নাট্যরচনায় প্রয়াসী হন। নাট্যকার এই নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে 'রাজস্থানে' বর্ণিত বিবরণের অবিকল অনুসরণ করেন নি। অবশ্য নাট্যকর স্বয়ং ই-এ প্রসঙ্গে নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, 'আমি যদিও এ নাটকের মূল বৃত্তান্ত "রাজস্থান" হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে, স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এই অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ, নাটক ইতিহাস নহে।'

বস্তুতঃ, 'তারাবাই' নাটকে নাট্যকার একদিকে যেমন 'রাজস্থানে' বর্ণিত বিবরণের অনুসরণ করেছেন, তেমনি অপরদিকে অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত চরিত্র এবং ঘটনার সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়।

নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্রগুলির সব ক'টিই 'রাজস্থান' গ্রন্থানুসরণে চিত্রিত। মেবারের রানা রায়মল, রায়মলের ভ্রাতা সূর্যমল, রানার তিনপুত্র যথাক্রমে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল ; সিরোহীর রাজা প্রভুরাও, পলায়িত তোড়া অধিপতি শূরতান এবং সৈন্যাধ্যক্ষ সারঙ্গদেব—এই সব ক'টি চরিত্রই ঐতিহাসিক। কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র সূর্যমলের স্ত্রী তারাবাইয়ের চরিত্রটই ঐতিহাসিক।

নাটকে রানার তিনপুত্রের মধ্যে বিবাদের কারণ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে—জীর্ণ, রুগ্ন, শয্যাগত রানা রায়মল মৃত্যুমুখে পতিত হবার ভান করলে তৎক্ষণাৎ পৃথ্বীরাজ সঙ্গের সঙ্গে মেবারের ভাবী উত্তরাধিকারীর দাবীর মীমাংসাকল্পে তরবারি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত রানা ছলনা ত্যাগ করে ক্ষুব্ধ চিত্তে বিবদমান পৃথ্বীরাজকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। সঙ্গকে বঞ্চিত করে রানা জয়মলকেই মেবারের ভাবী রানা রূপে মনোনীত করেন। 'রাজস্থানে' কিন্তু মেবারের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধীকারী প্রসঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত এক চারণীর ভবিষ্যৎবাণীকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল দেখা যায়। নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার অভিপ্রায়ে খুল্লতাত সূর্যমল সমভিব্যাহারে রাজপুত্রত্রয় এক চারণীর নিকট উপস্থিত হলে—

'Scarcely had Prithwiraj disclosed their errand, when the sybil pointed to the panther-hide as the decisive omen of sovereignty to Sanga, with a portion to his uncle···Prithwiraj drew his sword and would have falsified the omen, had not Surajmul stepped in and received the blow destined for Sanga, while the Prophetess fled from their fury. Suarjmul and Prithwiraj were exhausted with wounds, and Sanga fled with five sword-cuts and an arrow in his eye, which destroyed the sight for ever.' ৪৯

—এবং রানা এই সংবাদ অবগত হয়ে পৃথ্বীরাজকে নির্বাসিত

করেছিলেন। অর্থাৎ রানার মৃত্যুমুখে পতিত হবার ছলনা করে পুত্রদের পরীক্ষা করার ব্যাপারটি নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। অবশ্য চারণী কর্তৃক মেবারের ভাবী রানা হিসাবে সঙ্গের উল্লেখ নাটকেও রয়েছে।

রাজ্য থেকে বিতাড়িত পৃথ্বীরাজ নাড়োলে উপস্থিতহয়ে প্রয়োজনীয় কিছু উপকরণ সংগ্রহের জন্য নিজের অঙ্গুরীয়টি এক বণিকের কাছে বিক্রয় করতে গেলে পৃথ্বীরাজের প্রকৃত পরিচয়টি উদঘাটিত হয়ে পড়ে। যাইহোক শেষপর্যন্ত স্বীয় বাহু বলে পৃথ্বীরাজ মীনরাজ্যের অধিকারী হন। এসকল বিবরণ 'রাজস্থান' থেকেই গৃহীত।

বৃদ্ধ রানা রায়মলের বিরুদ্ধে সারঙ্গদেবের সহযোগিতায় সূর্যমলের বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহ দমনে পুনরায় পৃথ্বীরাজের মেবারে উপস্থিতি ঘটেছে। নাটকে সূর্যমলের চরিত্রটিকে অধিকতর বীর্যবান ও মাধুর্যমণ্ডিত করার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী সূর্যমল কর্তৃক তাঁর বিদ্রোহ বিষয়ে নির্বাসিত রাজকুমার পৃথ্বীরাজের উদ্দেশে পত্রপ্রেরণ এবং তাকে বৃদ্ধ রানার পক্ষাবলম্বনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন—নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনার পরিচয়বাহী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সূর্যমল এবং তাঁর স্ত্রী তমসা চরিত্র দু'টি ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের প্রভাবে প্রভাবিত। এমন কি সূর্যমলের মেবার রাজ্যলাভের উচ্চাশা পোষণের ব্যাপারে তমসার ইন্ধনদান 'রাজস্থান' বহির্ভূত বিষয়। অবশ্য যুদ্ধ অন্তে আহত খুল্লতাতের সংবাদ গ্রহণের অভিপ্রায়ে সূর্যমলের শিবিরে পৃথ্বীরাজের উপস্থিতি এবং ক্ষুধার্ত পৃথ্বীরাজের সূর্যমলের শিবিরে আহার্য গ্রহণের বিষয় 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে। টড এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

'It will shew the manners and feelings so peculiar to the Rajpoot, to describe the meeting between the rival uncle and nephew,—unique in the details of strife, perhaps, since the origin of man.' ৫০

পৃথ্বীরাজের হাতে সারঙ্গদেবের মৃত্যুবরণ এবং পৃথ্বীরাজ কর্তৃক কালীমূর্তিকে মৃত সারঙ্গদেবের রক্তদানের বিষয়টি 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত।—

'There was a small temple near the stockade, to which in the morning Prithwiraj requested his uncle to accompany him to sacrifice to cali, but the blow of the preceding night prevented him. Sarungdeo was his proxy. One buffalo had fallen, and a goat was obout to follow, when the Prince turned his swords on Sarungdeo. The combat was desperate ; but Prithwiraj was the victor, and the head of the traitor was placed as an offering on the altar of Time.' ৫১

—নাটকে অবশ্য কালীমন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে পৃথ্বীরাজ কর্তৃক সূর্যমলকে অনুরোধ জ্ঞাপনের বিষয়টি অনুপস্থিত। বরং সারঙ্গদেবের সূর্যমলের প্রতিনিধি স্বরূপ কালীমন্দিরে উপস্থিত হওয়ার কথাই উল্লিখিত হয়েছে।

পলাযিত তোড়া অধিপতি শূরতানের কন্যা তারাবাই, যার নামানুসারে আলোচ্য নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে, তার পাণিগ্রহণের শর্ত স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়েছিল তোডার পুনরধিকার। মোহমুগ্ধ রাজকুমার জয়মল তোড়া পুনরধিকার ব্যতিরেকেই তারাবাইকে লাভের আশায় অগ্রসর হলে ক্ষুব্ধ শূরতানের হাতে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। রানা রায়মল এই সংবাদ অবগত হয়ে শূরতানের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে দুষ্কৃতকারী সন্তানের উপযুক্ত শাস্তি বিধানে সন্তুষ্ট হয়ে শূরতানকে একখণ্ড রাজ্য দান করেছেন। নাটকে বর্ণিত এই বিষয়গুলি 'রাজস্থান' গ্রন্থানুসরণেই উল্লিখিত হয়েছে।

জয়মলের শোচনীয় মৃত্যুবরণের পর তোড়া পুনরধিকারের দ্বারা

পৃথ্বীরাজ কর্তৃক শূরতান অধিপতির কন্যা তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণও টড কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

শিরোহির অধিপতির সঙ্গে রানা রায়মল তাঁর এক কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু শিরোহী অধিপতি রানার কন্যার ওপর অকথ্য নির্যাতন করায় পৃথ্বীরাজ আপন ভগ্নীপতিকে সমুচিত শাস্তি দান করেন। অপমানিত শিরোহির অধিপতি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শেষ পর্যন্ত পৃথ্বীরাজকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। নাটকে পৃথ্বীরাজের বিষপ্রয়োগে মৃত্যু বর্ণিত হলেও এক্ষেত্রে নাট্যকার কিছু পরিমাণে স্বাধীন কল্পনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যানুরক্তি প্রসঙ্গে বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটকটির উল্লেখ করতে হয়। তাঁর পূর্বে গিরিশচন্দ্র প্রতাপসিংহের জীবন অবলম্বনে 'রাণা প্রতাপ' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র নাটকটি শেষ করেন নি। গিরিশচন্দ্রের পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'অশ্রুমতি' নাটকে রানা প্রতাপের জীবনের কিয়দংশকে চিত্রিত করেছেন সত্য, কিন্তু এ নাটকে ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনার আতিশয্য অনেক বেশি। অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত রানা প্রতাপের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটিকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই।

নাটকে প্রতাপসিংহ কর্তৃক কালীমূর্তির সম্মুখে রাজপুত সর্দারের শপথ গ্রহণ করানোর যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, তা টডের অনুসরণেই। রাজপুত সর্দারেরা চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ভূর্জ্জপত্রে ভোজন, তৃণশয্যায় শয়ন, মুঘলের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন না করা প্রভৃতি বিষয়ে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। টডের গ্রন্থেও এই ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে:

"...Pertap interdicted to himself and his successors every article of luxury or pomp, until the insignia of her glory should be redeemed. The gold and silver dishes were laid

aside for pateras of leaves; their beds henceforth of straw, and their beards left untouched. But in order more distinctly to mark their fallen fortune and stimulate to its recovery, he commanded that the martial nakaras, which always sounded in the van of battle or processions, should follow in the rear.' ৫২

নাটকে বর্ণিত হয়েছে, মেবারের ওপর আপন অধিকার রক্ষায় অসমর্থ রানা শেষ পর্যন্ত এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সমগ্র মেবারকে তিনি পরিত্যক্ত প্রান্তরে করেছিলেন পরিণত। গ্রামবাসীদের পর্বতদুর্গে আশ্রয় গ্রহণে করেছিলেন বাধ্য। পরিণামে সমগ্র জনপদ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে হয়েছিল পরিণত। প্রতাপের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সম্রাট আকবর মেবার অধিকার করলেও মেবার থেকে এক কপর্দকও সংগ্রহ করতে সমর্থ না হন। এইরূপে রানা, আকবরের মেবার অধিকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রতাপের এতাদৃশ পরিকল্পনার সমর্থন টডের বর্ণনাতেও মেলে—

'...being unable to keep the field in the plains of Mewar, he followed the system of his ancestors, and commanded his subjects, on pain of death, to retire into the mountains. During the protracted contest, the fertile tracts watered by the Bunas and the Beris, from the Aravali chain west to the eastern table-land, was be cheragh, 'without a lamp.'......The silence of the desert prevailed in the plains; grass had usurped the place of the waving corn; the high ways were choked with the thorny babool, and beasts of prey made their abode in the habitations of his Subjects.' ৫৩

এমন কি, রানার নির্দেশ অমান্য করে এক মেষরক্ষক চিতোর দুর্গ-পার্শ্বস্থ উপত্যকা ভূমিতে মেষ-চারণে রত হলে ক্রুদ্ধ রানার নির্দেশে

তার হত্যার যে ঘটনাটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে তারও সমর্থন মেলে টডের গ্রন্থে—

'In the midst of this desolation, a single goatherd, trusting to elude observation, disobeyed his prince's injunction, and pastured his flock in the luxuriant meadows of ontalla, on the banks of the Bunas. After a few questions, he was killed and hung up in terrorem.' [৫৪]

'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে যে সোলাপুর যুদ্ধে জয়লাভের পর হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তনকালে রাজা মানসিংহ স্বেচ্ছায় রানা প্রতাপের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন কমলমীরে। নাটকেও মানসিংহের স্বেচ্ছায় আতিথ্যগ্রহণের বৃত্তান্তটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তা এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে। মানসিংহ রানা প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু টডের গ্রন্থে মানসিংহের এতাদৃশ অভিপ্রায় বর্ণিত হয়নি। তবে মানসিংহের আহারের সময় রানা প্রতাপের ইচ্ছাপূর্বক অনুপস্থিতিজনিত বিরোধের প্রসঙ্গটি নাট্যকার টডের বর্ণনানুসরণেই উপস্থাপিত করেছেন। পরাজিত প্রতাপের শোচনীয় দুরবস্থা, মন্ত্রী ভীম সাহা (ভাম সা) কর্তৃক প্রতাপকে অর্থদান ; [৫৫] মৃত্যুকালে বিলাসী পুত্র অমরসিংহের ভবিষ্যৎ আচরণ তথা আদর্শ সম্বন্ধে রানার সংশয় ও মানসিক যন্ত্রণা-ভোগ, বিশ্বস্ত ভীলগণ কর্তৃক প্রতাপের অসময়ে সাহায্যদান, [৫৬] হলদিঘাটের যুদ্ধে বিশ্বস্ত মানা কর্তৃক প্রতাপের জীবন রক্ষা, [৫৭] বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ঘোড়া চৈতকের সাহায্যে হলদিঘাটের রণাঙ্গন থেকে প্রতাপের নিরাপদস্থানে প্রত্যাবর্তন এবং অতঃপর চৈতকের মৃত্যুবরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি নাট্যকার 'রাজস্থান' অনুসরণেই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্তনও লক্ষিত হয়ে থাকে।

নাটকে সম্রাট আকবরের চরিত্রের কামাতুর দিকটি চিত্রিত করা হয়েছে। পৃথ্বীরাজ সম্রাটের অজস্র গুণগানে নিমগ্ন হলে তাঁর পত্নী

যোশী সম্রাটের ইন্দ্রিয় লালসার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যোশীর ভাষায়:

'আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাক্‌তো, তাহলে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত!'

(চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

আপাতদৃষ্টিতে সম্রাটের এতাদৃশ চরিত্র-চিত্রণ অনৈতিহাসিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। নাট্যকারের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য:

'অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায়রূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি এরূপই বুঝিয়াছি।'

এইবার আকবরের এরূপ চরিত্র-চিত্রণের মূলটির সন্ধান করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, নাট্যকার এক্ষেত্রেও টডের বর্ণনার ওপরেই নির্ভর করেছেন—

'On one of these celebrations of the khooshroz the monarch of the Moguls was struck with the beauty of the daughter of Mewar, and he singled her out from amidst the united fair of Hind as the object of his passion. It is not improbable that an ungenerous feeling united with that already impure, to dispoil the Seesodias of their honour, through a Princess of their house under the protection of the sovereign. On retiring from the fair, she found herself entangled amidst the labyrinth of apartments by which egress was purposely ordained, when Akber stood before her: but instead of acquiescence, she drew a poniard from her corset and held it to his breast dictating, and making him repeat, the oath of renunciation of the infamy to all her race.' ৫৮

খোরাসান এবং মূলতানপতি কর্তৃক আক্রান্ত প্রতাপকে শেষ-

পর্যন্ত তাঁর ভ্রাতা শক্তসিংহ রক্ষা করেন। শক্তসিংহের হাতে খোরাসান এবং মূলতানপতি নিহত হন। অবশেষে এতাদৃশ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শক্তসিংহ সেলিমের পদাঘাত ও অপমান লাভ করেছেন, সর্বোপরি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে। পরিশেষে আকবর-তনয়া সাহাজাদী মেহের কর্তৃক শক্ত কারাগার থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন বলে নাটকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে টডের বর্ণনার সঙ্গে নাট্যকারের বর্ণনার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়ে থাকে। টডের বর্ণনায় দেখা যায় শক্তসিংহ সেলিমের কাছে আনুপূর্বিক সব সত্য ঘটনা বিবৃত করায় সেলিমই তাঁকে মার্জনা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতি' নাটকে কিন্তু এই বিষয়টি টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণেই বর্ণিত হতে দেখা গেছে।

জীবনের শেষের দিকে প্রতাপ তাঁর রাজ্যের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাটকে বর্ণিত হয়েছে শক্তসিংহ মানসিংহের প্রধান বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুঠ করেছেন। প্রতাপসিংহ কমলমীর অধিকার করে সেখানে দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করেছেন। উদিপুরও রানার করতলগত হয়েছে। প্রতাপের ভাষায় 'পুনরুদ্ধার বাকি মাত্র চিতোর, আজমীর আর মণ্ডলগড়ের।' 'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে—

'In one short campagin (S. 1586, A. D. 1530), he had recovered all Mewar, except cheetore, Ajmeer, and Mandal gurh : and determining to have a slight ovation in return for the triumph Raja Maun had enjoyed, he invaded Ambar, and sacked its chief mart of commerce, Malpura ' [৫]

পরিশেষে নাটকে বর্ণিত শক্তসিংহের জীবনী ও প্রতাপের সঙ্গে শক্তের বিরোধের কারণটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শক্তসিংহ যখন মাত্র পাঁচ বছরের বালক, সেই সময়ে একদিন একখানি ছুরিকার ধার পরীক্ষাকল্পে বালক শক্ত নিজের হাতেই অম্লানবদনে তা বসিয়ে-

ছিলেন। এদিকে শক্তের কোষ্ঠীপত্রে ছিল যে তিনিই ভবিষ্যতে জন্মভূমির অভিশাপরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। বালকের পূর্বোক্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে পিতা উদয়সিংহ কোষ্ঠীপত্রের বক্তব্যে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে বালককে হত্যার আদেশ দেন। এদিকে নিঃসন্তান সালুম্ব্রাধিপতি গোবিন্দসিংহ শক্তকে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী করার মানসে রানার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গোবিন্দসিংহ শক্তসিংহকে গ্রহণ করার পরে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন প্রতাপ মেবারের রানা। শেষে সালুম্ব্রাধিপতির অনুরোধে শক্ত প্রতাপের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। অতঃপর একদিন শিকার উপলক্ষে দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। একজন অপরজনের প্রতি যখন অস্ত্রাঘাতে উদ্যত, এমন সময় কুলপুরোহিত সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে স্বয়ং অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। ক্ষুব্ধ প্রতাপ এই ব্রাহ্মণ হত্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে শক্তকেই দায়ী করেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে রাজ্য পরিত্যাগের নির্দেশ দেন। প্রতাপ কর্তৃক বিতাড়িত শক্ত প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য সম্রাট আকবরের পক্ষে যোগদান করেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেষপর্যন্ত হলদিঘাটের যুদ্ধে খোরাসান ও মুলতানপতিকে হত্যা করে নিঃসঙ্গ প্রতাপের প্রাণরক্ষার মাধ্যমে শক্তসিংহের সঙ্গে প্রতাপের দীর্ঘকালের বৈরিতার ঘটে অবসান। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল উপরোক্ত ঘটনাসকল বর্ণনার ব্যাপারেও টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচকের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, 'তথ্যানুরক্তি ও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধির দিক থেকে এই নাটককে ত্রুটিহীন বলা যায়।'[৬০]

দ্বিজেন্দ্রলালের মুঘল-রাজপুত ইতিহাস কেন্দ্রিক নাটকগুলির উপাদান প্রধানতঃ টডের 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত। অবশ্য ঐতিহাসিক উপকরণের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের এই পর্যায়ের সব কয়টি

নাটকই যে সমান ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভের অধিকারী, তা নয়। বিশেষ এক আদর্শ প্রচারের প্রবণতা এবং সর্বোপরি তীব্র রোমান্টিক ভাবপ্রাবল্য কোন কোন নাটকের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) এবং বিশেষতঃ 'মেবারপতন' (১৯০৮) নাটক দু'টি উল্লেখযোগ্য।

'দুর্গাদাস' নাটকটিতে নাট্যকার মাড়বারের সেনাপতি দুর্গাদাসের চরিত্র মাহাত্ম্যকেই মুখ্যতঃ অঙ্কিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এবং চরিত্রটিকে সর্বগুণমণ্ডিত করে তোলার অভিপ্রায়ে এমন কিছু উৎকট অনৈতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করেছেন, যা নাটকটির ঐতিহাসিক মর্যাদাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। সেই সঙ্গে দুর্গাদাস চরিত্রটিও অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হয়েছে।[৬১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার কর্তৃক দুর্গাদাসের দর্শনমাত্রে তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং দুর্গাদাসের নিকট প্রেম নিবেদন, কিন্তু দেবোপম চরিত্রের অধিকারী দুর্গাদাস কর্তৃক সেই প্রেম প্রত্যাখ্যানের বিষয় 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়নি। 'রাজস্থানে' দুর্গাদাসের প্রসঙ্গ নিতান্ত সীমিত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার স্বকপোলকল্পিত তথ্যাদির সংযোজনে দুর্গাদাস চরিত্রটিকে বিস্তৃততর পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। তবে সম্রাট-তনয় অসহায় আকবরকে দুর্গাদাসের আশ্রয়দান প্রসঙ্গটি 'রাজস্থানে' বর্ণিত হতে দেখা গেছে।

নাটকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রানার বিবাদের মুখ্য কারণস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে রানা কর্তৃক সম্রাটকে জিজিয়াকর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে পত্র প্রেরণ। গৌণ কারণের মধ্যে অন্যতম কুমার অজিতসিংহকে আশ্রয়দান। এইসকল তথ্যাবলীও 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত—

'On the promulgation of that barbarous edict, the jezeya, the Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty, yet temperate resolve...'[৬২]

'This letter, the sanctuary afforded Aji·, and the carrying off of his betrothed, made him pour out all the phials of his wrath against the devoted Mewar'[৬৩].

নাটকে মহারাণা রাজসিংহের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারকে 'রাজস্থানে'র ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করতে দেখা গেছে। রাজসিংহের বিরল কর্তব্যবোধ, অসীম সাহসিকতা, বীর্যবত্তা, সর্বোপরি আদর্শপরায়ণতা বস্তুতঃ প্রশংসার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে বিপদ অগ্রাহ্য করে যশোবন্তের বিধবা পত্নীকে আশ্রয়দানের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'একটিমাত্র চরিত্র এই নাটকে সুন্দর এবং সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহা মেবারের রাণা রাজসিংহের চরিত্র'।[৬৪] রাজসিংহের চরিত্র চিত্রণেও নাট্যকার টডকেই অনুসরণ করেছেন লক্ষ্য করা যায়। টডের বর্ণনায়:

'As a skilful general and gallant soldier, in the defence of his Country, he is above all praise. As a chivalrous Rajpoot, his braving all Consequences when called upon to save the honour of a noble female of his race, he is without parallel. As an accomplished Prince and benevolent man, his dignified letter of remonstrance to Arungzeb on the promulgation of the Capitation edict, places him high in the scale of moral as well as intellectual excellence;

যশোবন্তসিংহের বিধবা মহিষীর যে বীরাঙ্গনা রূপটি নাটকে চিত্রিত হয়েছে তা স্বভাবতঃই আমাদের শ্রদ্ধা মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করে থাকে। স্বামী হত্যাকারী মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাড়বার ও মেবারকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। শিশুপুত্র অজিত সিংহকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ করে বিধবা মহিষী রাঠোর জাতিকে মুঘল সম্রাটের প্রতিরোধে উত্তেজিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন। টডের বর্ণনায়:

'The mother of Ajit, the infant heir of Marwar, a woman of the most determined character, was a Princess of Mewar; and she threw herself upon the Rana as the natural guardian of his rights, for sanctuary during the dangers of his minority. This was really yielded, and kailwa assigned as his residence, where under the immediate safeguard of the brave Doorgadas, Ajit resided, while she nursed the spirit of resistance at home A unity of interests was thus cemented between these the chief states of Rajpootana, for which they never before had such motive…'[৬৬]

নাটকের জয়সিংহ চরিত্রটিও ইতিহাসাশ্রিত। জয়সিংহের স্ত্রৈণভাব, রাজকার্যে ঔদাসীন্য 'রাজস্থানে'ও উল্লিখিত হয়েছে। জয়সিংহের একাধিক রাণীর উল্লেখ টডও করেছেন। তবে 'কমলা'[৬৭] নামটি 'রাজস্থানে' উল্লিখিত হলেও 'সরস্বতী' নামটি নাট্যকারের স্বকপোল-কল্পিত। এমন কি ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে জয়সিংহের সন্ধি স্থাপন, অমরসিংহকে মন্ত্রীর অভিভাবকত্বে রেখে রাণী কমলার সঙ্গে অন্যত্র পৃথক প্রাসাদে বসবাস প্রভৃতি বিষয়ও 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

নাটকে জয়সিংহ ও ভীমসিংহের জন্মবৃত্তান্ত, মেবারের ভাবী রানা রূপে রাজসিংহ কর্তৃক জয়সিংহের মনোনয়ন, সন্ধির শর্তস্বরূপ রানার নিকট মুঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর পুত্রদের গচ্ছিত রাখা, সম্রাট-তনয় আকবরের প্রতি রাজপুত সৈন্যদের সমর্থন, শেষে আকবরের প্রতি রাজপুত সৈন্যদের সমর্থন বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে সম্রাটের পত্রপ্রেরণ, পরিশেষে আকবরের ব্রিটিশ জাহাজে পারস্য গমন—প্রভৃতি ঘটনাও 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত।

অপরপক্ষে ঔরঙ্গজেব মহিষী গুলনেয়ার, আকবর-দুহিতা রাজিয়া-উৎ-উন্নিসা প্রভৃতির আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ কেবলমাত্র অস্বাভাবিকই নয়, সেই সঙ্গে অসঙ্গত এবং অনৈতিহাসিকও বটে। তবে সম্রাট

ঔরঙ্গজেবের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার ইতিহাসকেই অনুসরণ করেছেন লক্ষ্য করা যায়

দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতনে' (১৯০৮) পূর্বোল্লিখিত রাজপুত মুঘল কেন্দ্রিক নাটকগুলির তুলনায় আদর্শ প্রচারের প্রবণতা সর্বাপেক্ষা প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। নাটকটি তাই একান্ত-ভাবেই উদ্দেশ্যমূলক রচনায় পর্যবসিত। অবশ্য নাট্যকার স্বয়ংই ভূমিকায় নাটকে 'এক মহানীতি' প্রচারের সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন।

নাটকটি প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রানা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের কথা। নাটকে চরিত্রটিকে একান্তভাবে দৃঢ়তাহীন, যুদ্ধ-বিমুখ, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে উদ্‌গ্রীব, আত্মমর্যাদাহীন রানা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর পিতা রানা প্রতাপের আজীবন সংগ্রাম কিংবদন্তীতে পরিণত, সেই অদ্বিতীয় রানা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহকে ব্যক্তিত্বহীন এবং নিছক রাজ্যের কল্যাণে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে আগ্রহী দেখে স্বভাবতঃই পাঠক দুঃখ অনুভব না করে পারে না। সেনাপতি বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহ, মেবারের সামন্তগণ, চারণী সত্যবতী প্রমুখেরা বারংবার অমরসিংহকে মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করায় শেষপর্যন্ত রানা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ অমরসিংহ সম্বন্ধে সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে:

'...সেই মেবারে সেই দেবতার কুটীরগুলি ভেঙে সম্ভোগে নাট্যভবন নির্মিত হতে দেখেছি। সেই মহাত্মার (রানা প্রতাপের) মন্দির চূর্ণ করে তারই প্রান্তরে ঐশ্বর্যের প্রাসাদ গঠিত হতে দেখেছি। তাঁর সেই জয়ধ্বনি মুখরিত শৈলচ্ছায়ে বিলাসের নিকুঞ্জবন রচিত হতে দেখেছি।'

(মেবার পতন; ১ম অঙ্ক; ২য় দৃশ্য)

'রাজস্থানে'ও অমরসিংহের এতাদৃশ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ লক্ষিত হয়ে থাকে। টড বলেছেন:

'...at one time seemed likely to bring about the realisation of his father's prophetic fears. Amra constructed for himself a palace on the banks of the lake, named after himself the 'abode of immorality,' remarkable for its Gothic contrast to the splendid marable edifice erected by his predecessors, and now the abode of the princes of Mewar, yet a residence by no means devoid of stately luxury, and one ill calculated to foster the memory of his father's admonitions.'

কিন্তু এইখানেই অমরসিংহ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। টড আরও বলেছেন :

'All comment is superfluous on such a character as that of Rana Umra. He was worthy of Pertap and his race. He possessed the physical as well as the mental qualities of a hero, and was the tallest and strongest of all the princes of Mewar.'[৬৮]

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নাটকে নাট্যকার অমরসিংহের আংশিক চিত্রকেই রূপায়িত করেছেন। অতএব অমরসিংহ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

'অমরসিংহের চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার ঐতিহাসিক মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

...ইতিহাসেও তাঁহার এই পরিচয় পাওয়া যায়।'[৬৯]

সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

মুঘলের আশ্রিত অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত সগরসিংহের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার ঐতিহাসিক মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক সগর চিতোরের রানা রূপে নিযুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তিনিই স্বয়ং চিতোরের অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিত্যাগ করে অমরসিংহের উপর তা ন্যস্ত করে ফিরে গেলেন। এবং শেষে স্বয়ং

সম্রাট সমক্ষে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। 'রাজস্থানে'ও অনুরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় :

'Sugra, who abandoned Pertap and went over to Akber, was selected ; the sword of investiture was girded on him by the emperor's own hands ; and under the escort of a Mogul force, he went to reign amidst the ruins of cheetore. ...he restored to him cheetor, retiring to the isolated Kandhar. Sometime after, upon going to court, and being upbraided by Jehangir, he drew his dagger and slew himself in the emperor's presence : an end worthy of such a traitor.' ৭০

'মেবার পতন' নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র রানা প্রতাপের সুদীর্ঘকালের পার্শ্বচর সালুম্ব্রাধিপতি গোবিন্দ সিংহ। স্বদেশপ্রেম, গভীর আত্মমর্যাদাবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সর্বোপরি সঙ্কল্পে তিনি অটুট। বস্তুতপক্ষে গোবিন্দসিংহ রাজপুত কুলগৌরব। নাটকে এঁর চরিত্রটিও টডের বর্ণনানুসরণেই চিত্রিত। মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে রানার ইতস্তত: আচরণে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত গোবিন্দ-সিংহের আয়না চূর্ণ করার ব্যাপারটিও টড বর্ণনা করেছেন

'A magnificent mirror of European fabrication adorned the embryo palace. Animated with a noble resentment at the inefficacy of his appeal to the better feelings of his Prince, the chieftain of Saloombra hurled 'the Slave of the Carpet' against the splendid bauble, and starting up, seized his sovereign by the arm and moved him from throne.' ৭১

মুঘল সেনাপতি আবদুল্লা, শাহজাদা পরভেজ প্রভৃতিদের সঙ্গে রাজপুত সৈন্যদের যুদ্ধের বর্ণনাতেও 'রাজস্থানে'র অনুসরণ লক্ষণীয়।

পরিশেষে নাটকের নারীচরিত্রগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে

পারে। মানসী, সত্যবতী এবং কল্যাণী চরিত্রত্রয়ে একই সত্তার ত্রিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ মানসী চরিত্রটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলেই প্রতিভাত হয়েছে।

টড রচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। যে টডের গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশের উৎসরূপে পরবর্তীকালে গৃহীত হবে, তার প্রথম যে কাহিনী অবলম্বনে বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচিত হ'ল তা–পদ্মিনীর উপাখ্যান। পরবর্তীকালে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই কাহিনীটিকেই তাঁর 'পদ্মিনী' নাটকে (১৯০৬) রূপায়িত করেন।

সুবিশাল 'রাজস্থান' গ্রন্থ বহুবিধ চরিত্র এবং বৈচিত্র্যময় আখ্যানের আকরস্বরূপ। কিন্তু তবু তন্মধ্যে এমন দু'একটি চরিত্র এবং ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা একাধিক কারণেই বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এইজন্য এইসকল চরিত্র ও আখ্যান অবলম্বনে একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেছে। পদ্মিনীর উপাখ্যান 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত এমনই এক আকর্ষণীয় বিষয়—যা একাধিক কারণেই লেখকদের করেছে আকৃষ্ট।

অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রাজা ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর প্রতি সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রলোভন এবং তাঁকে লাভের আশায় নিজ শিবিরে আগত বৃদ্ধ রাজার প্রতি সম্রাটের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা, অতঃপর পদ্মিনী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে কিরূপে বন্দী রাজাকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সে কাহিনী কেবলমাত্র চিত্তাকর্ষকই নয়, সেই সঙ্গে বিস্ময়করও বটে। এরপর প্রতারিত সম্রাট প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য চিতোর আক্রমণ করলে চিতোর রক্ষার জন্য রাজপুত-গণ সর্বস্বপণ করে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেও শেষ-পর্যন্ত মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হলে পদ্মিনীসহ সকল ক্ষাত্রিয় রাজপুত রমণী কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে প্রাণ বিসর্জন দেন। বাস্তবিক চিতোর রক্ষার ব্যাপারে রাজপুত বীরগণের বীরত্ব

রাজপুত ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। আর সেই সঙ্গে কঠিন জহরব্রতের ন্যায় গাম্ভীর্যময় ও বিষাদ-ভারাক্রান্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা পদ্মিনীর উপাখ্যানকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই জন্যই কবিবর রঙ্গলাল এবং পরবর্তীকালে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিশেষ ভাবে পদ্মিনীর উপাখ্যানকেই তাঁদের গ্রন্থের বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যিনি 'প্রতাপাদিত্যে'র [১২] মত নাটক রচনা করে জাতীয়ভাব প্রচারমূলক নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তকের গৌরব লাভের অধিকারী হয়েছিলেন, তিনি যে স্বদেশীভাব প্রচারের মহত্তর উদ্দেশ্যেই 'পদ্মিনী'র মত নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনার ভূমিকায় বর্ণিত বক্তব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙ্গালায় যে ঐতিহাসিক নাটক এবং উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হ'ল, তার মূলে ছিল তৎকালীন স্বাদেশিক চেতনা। তাই মুখ্যতঃ রাজপুত বীরত্বের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছিলেন প্রয়াসী। কবি রঙ্গলাল পদ্মিনীর আখ্যান বিষয়ক কাব্য রচনার ভূমিকাংশে বলেছেন—

'আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ, ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের উত্তাবৎ শ্রদ্ধাই নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা-বৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্য-প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান কালাবধি-বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কাল মধ্যে এতদ্দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে-কিছু ভগ্নাবশেষ,

তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যে রূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য-পাঠে লোকের আশু-চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত করলাম।'

—অনুরূপ বক্তব্য ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বয়ং না প্রকাশ করলেও এই একই মানসিকতা তাঁর 'পদ্মিনী' নাটক রচনার ক্ষেত্রে যে কাজ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের নাটকীয়তা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য :

'গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ক্ষীরোদ প্রসাদ ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে যাইয়া ইতিহাসকে খুব বিশ্বস্তভাবে অনুবর্তন করেন নাই। অনেক স্থলেই তিনি নিজের প্রয়োজনমত কল্পনাশ্রয়ী হইয়া অভিনব ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন।'৭৩

আমাদের আলোচ্য 'পদ্মিনী' নাটকটির ক্ষেত্রে কিন্তু সমালোচকের এতাদৃশ মন্তব্য তেমন প্রযোজ্য নয় বলেই স্বীকার করতে হয়। বরং নাট্যকার টডের বর্ণনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন লক্ষিত হয়ে থাকে।

নাটকে বর্ণিত হয়েছে, রানা লক্ষ্মণসিংহের অনুপস্থিতিকালে সম্রাট আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই প্রথম আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হ'ল। অতঃপর উজীরকন্যা নসীবনের নিকট থেকে রাজা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনীর অপনরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনায় সম্রাট পদ্মিনীকে দেখতে প্রলুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু সম্রাটের সম্মুখে হিন্দুকুল-কামিনীর উপস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সম্রাট রাজা ভীমসিংহ প্রস্তাবিত দর্পণে প্রতিফলিত পদ্মিনীর অপরূপ রূপ-লাবণ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পদ্মিনীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন। অতিথি-পরায়ণ বিশ্বাসী ভীমসিংহ সম্রাটকে তাঁর শিবির পর্যন্ত পৌঁছে দিতে

গেলে বিশ্বাসঘাতক সম্রাট কর্তৃক অন্তরীণ হয়েছেন। এবং রাজার মুক্তিপণ স্বরূপ সম্রাট পদ্মিনীকেই দাবী করেছেন।

—এই প্রসঙ্গে 'রাজস্থানে'র বর্ণনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'The Hindu bard recognizes the fair, in preference to fame and love of conquest, as the motive for rhe attack of Alla-o-din.

Who limited his demand to the possession of Pudmini; though this was after a long and fruitless seize. At length he restricted his desire to a mere sight of this extraordinary beauty, and acceded to the proposal of beholding her througb the medium of mirrors.

...The Rajpoot, unwilling to be outdone in confidence, accompanied the king to the foot of the fortress, amidst many Complimentary excuses from his guest at the trouble he thus occasioned....Here he had an ambush; Bheemsi was made prison, hurried away to the Tatar Camp, and his liberty made dependent on the surrender of Pudmini.' [১৪]

শেষ পর্যন্ত কিরূপ কৌশলে রাজা ভীমসিংহ সম্রাটের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন নাটকে তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও নাট্যকার টডের বর্ণনা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। এমন কি নাটকে রানা কর্তৃক চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শন লাভ এবং দেবী কর্তৃক রাজকুমারদের আত্মবলিদানে নির্দেশদানের প্রসঙ্গটিও টডের অনুসরণেই রচিত। অবশ্য টড যেখানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একাধিকবার আবির্ভাব এবং চিতোরে তাঁর অবস্থানের শর্ত-স্বরূপ রাজপুত্রদের আত্মবলিদানের নির্দেশদান বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, সেক্ষেত্রে নাটকে এই প্রসঙ্গ একবার মাত্র বর্ণিত হয়েছে। তবে অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে নাটকের একেবারে সমাপ্তির সময়ে চিতোর-ঈশ্বরীর ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব উল্লিখিত হয়েছে।

স্বদেশভূমি রক্ষার্থে আত্মবলিদানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখ্যতঃ অরুণ সিংহ এবং অজয়সিংহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নাটকে অজয়সিংহের পরিবর্তে পদ্মিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র বালক বাদলের প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। টডের বর্ণনার সঙ্গে নাটকের বর্ণনার অপর একটি পার্থক্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। টড অজয়সিংহকে রানার আপন সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু নাটকে অজয়সিংহকে মহারাজ ভীমসিংহের পুত্র বলে বলা হয়েছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অজয়সিংহ যে মহারাণার বিশেষ প্রিয়পাত্র তা লক্ষ্য করা যায়।

আত্মসম্মান রক্ষার্থে পুরনারীবৃন্দের কঠিন জহরব্রতানুষ্ঠানের বিষয়ও টডের বর্ণনানুগত। টডের গ্রন্থে শিকার উপলক্ষে অরুণসিংহের সঙ্গে এক চৌহান বংশীয় রমণীর (daughter of a poor Rajpoot of the chundano tribe—one of the branches of the Chohan) সাক্ষাৎকার এবং পরিশেষে উভয়ের মধ্যেকার বিবাহবিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকীয় বৈচিত্র্য ও সেই সঙ্গে সম্ভবতঃ নাটকের কলেবর বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এই কাহিনীটিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে এক মনোরম উপভোগ্য রোমান্টিক আখ্যানে করেছেন রূপান্তরিত।

নাটকে পদ্মিনীর যে পিতৃ-পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি সিংহলরাজ হামিরশঙ্কের একমাত্র কন্যা। টডও বলেছেন:

'He (Bheemsi) had espoused the daughter of Hamir Sank (chohan) of ceylon, the cause of woes unnumbered to the Sesodias. Her name was Pudmini.' [১৫]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'আহেরিয়া' নাটকটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। নাটকটি 'রাজস্থানে'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত যশল্মীরের অন্তর্গত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটক হিসাবে ত্রুটি ক্ষীরোদপ্রসাদের ত্রুটিপূর্ণ রচনা। নাট্যকার আলোচ্য নাটকটিতে

নাটকীয় রসসৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন। নাটকটির ফলশ্রুতি বারাহাপতি মূলরাজের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে—

'বারাহা—লালাই—ভট্টি ত্রিশক্তি মিলনে
তোমাদের প্রেম—আচ্ছাদনে
এক জাতি এক প্রাণ—এক ভাষা এক গান
অটুট অব্যয় শক্তি হ'ক রাজস্থান।'

নাটকটির নাম 'আহেরিয়া' হলেও 'রাজস্থানে' আহেরিয়া উৎসবের যে তাৎপর্য, সেই তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়নি। ঐতিহাসিক উপাদান অপেক্ষা লেখকের কল্পনাই নাটকের বিস্তৃততর ক্ষেত্র অধিকার করেছে।

'রাজস্থানে'র বিষয় ও চরিত্র অবলম্বনে কেবলমাত্র যে মাইকেল মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত খ্যাতনামা ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকারেরাই নাটক রচনা করেছিলেন তা নয়, কয়েকজন স্বল্পখ্যাত অথবা অপরিচিত নাট্যকারও বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন। লেখক নির্বিশেষে রচনাকালের ক্রমানুযায়ী এঁদের নাটকগুলি আলোচিত হ'ল।

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ১২৮১ সালে চতুর্থ অঙ্কে সমাপ্ত 'তারাবাই' নাটকটি রচনা করেন। অক্ষম লেখকের রচিত এই স্বল্পায়তন নাটকটি কোন অংশেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাই'য়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

তারাবাইকে বিবাহের শর্ত—তার পিতা শুরতানের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার, ভগ্নীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ভগ্নীপতির উপযুক্ত শাস্তিবিধান করায় শেষ পর্যন্ত এই কারণে ভগ্নীপতির বিষপ্রয়োগের ফলে পৃথ্বীরাজের মৃত্যুবরণের ন্যায় ঘটনাগুলি টডের বর্ণনানুসরণেই রচিত।

শরৎচন্দ্র দে প্রণীত 'শিলাদিত্য' নাটকটি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে রচিত। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকে রাইসিনার সামন্তরাজ শিলাদিত্যের চক্রান্তে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে সংগ্রামসিংহের পরাজয় বরণ রূপায়িত হয়েছে।

বলাবাহুল্য শিলাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতা 'রাজস্থান' অবলম্বনেই বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির সংলাপ অধিকাংশক্ষেত্রে পদ্য ছন্দে রচিত।

'জাগরিতা' বা 'মিবার-কীর্ত্তি' নাটকটির রচয়িতা মনোমোহন রায়। নাটকটির প্রকাশকাল ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

রানা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের বিরোধের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম প্রচারই ছিল লেখকের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। সেইজন্য প্রতাপের অদ্বিতীয় বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে তিনি রূপায়িত করেছেন। জন্মভূমির শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য পালনের আহবান নাটকের নানাস্থানে পরিস্ফুট—

স্বর্গ হতে গরীয়সী মাতৃভূমি
উদ্ধারের তরে মাতৃভক্ত পুত্রগণ
আজি সমবেত জাতীয়—পতাকাতলে।
আমরাও ক্ষুদ্র স্বার্থ দিব বলিদান'।

নাটকে কয়েকটি অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়—

'না মিলাতে।
সমর—ভেরীর রব রাজপুতানার
সৌভাগ্য গগনে, দূর বঙ্গদেশে ওই
শুন রাণা, রণশিঙ্গা উঠিল বাজিয়া,
দম্ভোসি নির্ঘোষে। তড়িতের মত বঙ্গে
প্রবাহিত হল জাতীয় জীবন।'

নাটকে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে এবং রানা প্রতাপ যশোহরের প্রতাপের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেছেন। মানসিংহকে সম্রাট আকবর হত্যা করতে গিয়ে নিজের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। সর্বোপরি, ইংরেজ শাসনের সূচনা ও ইংরেজ শাসনে ভারতের উন্নতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

"পূর্ণবেগে সোনার ভারত—
উন্নতির পথে হইতেছে অগ্রসর

যাঁর করুণায়, ওই সেই ইংলণ্ডের
রাজলক্ষ্মী, "লক্ষ্মীকুলমাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ
আদরিণী বিধাতার।"

প্রতাপও ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতের উন্নতির কথা অবহিত হয়ে নিশ্চিন্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 'রাজস্থানে' বর্ণিত কাহিনীর প্রতি লেখক তেমন আনুগত্য দেখান নি।

গিরিজামোহন নিয়োগী প্রণীত 'মেবার মহিমা বা রাজপুত গরিমা' নাটকটি ১৩১৬ সনে প্রকাশিত। নাটকটি 'রাজস্থানে' বর্ণিত লাক্ষরানার পুত্র চণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কোনকোন ক্ষেত্রে অবশ্য নাট্যকার 'রাজস্থানে'র অনুসরণ না করে স্বাধীন মানসিকতার দ্বারা চালিত হয়েছেন লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডের পত্নী কর্তৃক ভীল রমণীদের দ্বারা এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন, রণমল্লের পুত্রবধূ এবং যোধরাওয়ের পত্নীর চণ্ডের পত্নীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ—লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

'রাজস্থানে' বর্ণিত রঘুদেবের মৃত্যু কাহিনী আলোচ্য নাটকে ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে উপস্থাপিত। 'রাজস্থানে' রণমল্ল কর্তৃক রঘুদেবকে পরিচ্ছদ উপহার দানেব বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং এই পরিচ্ছদ পরিধান কালেই গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য নাটকে কিন্তু পরিচ্ছদের বিষয় কিছুই উল্লিখিত হয়নি।

সাধারণতঃ চণ্ড বিষয়ক অধিকাংশ নাটকেই প্রথমাবধি চণ্ডের প্রতি রাজমাতার বিতৃষ্ণার ভাবটি প্রকাশিত। কোন কোন ক্ষেত্রে চণ্ড কর্তৃক তাঁকে বিবাহ করার ব্যাপারে অস্বীকৃতিই রাজমাতাকে তাঁর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছিল বলে দেখা যায়। প্রসঙ্গত গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকটি এবং জ্যোতিশচন্দ্র লাহিড়ীর 'চিতোর কুমার' নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে চণ্ডের সঙ্গে রাজমাতার সম্পর্ক প্রথমদিকে স্বাভাবিক দেখান হয়েছে। পরবর্তীকালে কূট রণমল্লের চক্রান্তে তাঁকে চণ্ড বিরোধী রূপে দেখা

গেছে। চণ্ডের প্রতি রাজমাতার বিতৃষ্ণার ভাবটি বর্ণনায় নাট্যকার যথার্থ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এ পর্যন্ত কোন নাটকেই মুকুলের অভিষেক দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দেখা যায়নি। আলোচ্য নাটকে এই অভিষেকের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। নাটকে মাঝে মাঝে নির্মল হাস্যরসের স্পর্শ পাওয়া যায়। মোটের ওপর নাটকটি উপভোগ্য ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে। কোন প্রকার অবাস্তবতা নাটকটিতে স্থান পায়নি।

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে যাঁরা বাঙ্গালায় কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশকেই 'রাজস্থানে'র ১ম খণ্ডে বর্ণিত মেবারের কাহিনীকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করতে দেখা গেছে। কিন্তু 'রাজস্থানে'র ২য় খণ্ডে বর্ণিত কাহিনী অথবা চরিত্র অবলম্বনে যে ক'টি নামমাত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'উদয়সিংহ' (১৯১২) নাটকটি অন্যতম। আপাতভাবে এই উদয়সিংহকে শিশোদীয় উদয়সিংহ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লেখক নাটকে রাঠোর বংশোদ্ভুত রাও উদয়সিংহের কাহিনীকেই উপস্থাপিত করেছেন। বাস্তবিক, উদয়সিংহ নামে যিনিই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর দ্বারাই রাজ্যের সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য নাটকের রাঠোর বংশোদ্ভুত মালদেবের পুত্র রাও উদয়সিংহও তার ব্যতিক্রম নন।

মালদেবের আর এক পুত্র চন্দ্রসেনের অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে। তবে চন্দ্রসেনের বিরোধিতার জন্যই উদয়সিংহের সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকারের বিষয়টি লেখকের স্বকল্পিত। 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে উদয়সিংহকে মালদেব বাধ্য হয়ে আকবরের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, নতুবা মারবারে রাঠোর আধিপত্য নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা ছিল। অদৃষ্টের পরিহাসে যিনি পিতৃপুরুষের স্বাধীনতা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, সেই উদয় স্বাধীনতা লাভে

প্রয়াসী হওয়া দূরের কথা, বরং পরাধীনতার শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করেছিলেন। নাটকে উদয়সিংহকে তেজস্বী বলা হয়েছে—

উদয়সিংহ বড়ই তেজস্বী কেমনে
হস্তগত করিব তাহায় ? (১ম অঙ্ক ; পৃঃ ২০)

কিন্তু নাটকে তার তেজস্বিতার কোন পরিচয়ই লক্ষিত হয় না। উদয়সিংহ কর্তৃক আপন ভগিনী যোধবাইয়ের সঙ্গে আকবরের বিবাহ-দানের বিষয় 'রাজস্থানে'ও উল্লিখিত হয়েছে। নাটকে সংযোজিত উদয়সিংহের মৃত্যু সম্পর্কিত অভিনব কাহিনীটিও 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত। উদয়ের পুত্র শূরসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির বিষয়টিও টডের গ্রন্থাবলম্বনেই রচিত। নাটকে চন্দ্রসেনকে রাঠোররাজ মালদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হয়েছে—

জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রসেন
বর্তমান, তাঁহার আদেশ বিনে কোনও
কার্য করিতে তব নাহি অধিকার। (২য় অঙ্ক ; পৃঃ ৭৫)

কিন্তু 'রাজস্থানে' উদয়সিংহকেই মালদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হয়েছে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, নাটকে গৃহীত কাহিনীটির যথেষ্ট নাটকীয়তা থাকা সত্ত্বেও লেখক সেই সম্ভাবনাময় কাহিনীটিকে সার্থকভাবে নাটকে রূপায়িত করতে সমর্থ হন নি।

জ্যোতিশচন্দ্র লাহিড়ী রচিত 'চিতোরকুমার' নাটকটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। নাটকটি আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট। নাটকের ভূমিকায় মনীষী জলধর সেন বলেছেন, 'নবীন লেখক যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন সে ঘটনাটি অতি সুন্দর, তাহাতে বিশেষ বৈচিত্র্যও আছে। লেখকের এই প্রথম চেষ্টা হইলেও তিনি ঘটনার সৌন্দর্য নষ্ট করেন নাই ; বরঞ্চ মূল ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই নাটকখানির মধ্যে তিনি যে সকল কাল্পনিক চিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন তাহাও অতি সুন্দর হইয়াছে ;'

রাজস্থানের বর্ণিত হয়েছে—মারবাররাজ রণমল্ল তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে নারকেলহস্ত এক দূতকে রানা লাক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। লাক্ষ নারকেল আনয়নকারী দূতের কাছে রণমল্লের কন্যা সম্পর্কে কৌতুক প্রকাশ করায় রানার জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ড রণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন। শেষ পর্যন্ত রণমল্লের কন্যাকে বৃদ্ধ রানা লাক্ষ স্বয়ং বিবাহ করেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্মতিক্রমে বৃদ্ধ রানার নবপরিণীতা পত্নীর সন্তান বালক মুকুল চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর মুকুলের প্রতিনিধিস্বরূপ ভ্রাতৃবৎসল চণ্ড চিতোরের শাসনভার পরিচালনা করায় রাজমাতার মনে চণ্ড সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। চণ্ডের আধিপত্য থেকে চিতোরকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে রাজমাতা তাঁর পিতৃদেব রায় রণমল্লের শরণাপন্ন হন। অতঃপর রণমল্ল চক্রান্ত করে চিতোর অধিকারে অগ্রসর হলে শেষে রাজমাতার অনুরোধে স্বেচ্ছা নির্বাসিত চণ্ড চিতোর রক্ষার্থে অগ্রসর হন। রণমল্লের মৃত্যু ঘটে এবং চিতোর শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়। 'রাজস্থানে' বর্ণিত এই চিত্তাকর্ষক উপাখ্যানের সার্থক নাট্যরূপ মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকে দেখা গেছে। আমাদের আলোচ্য 'চিতোর কুমার' নাটকটি সেই একই বিষয় অবলম্বনে রচিত হলেও মূল কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ এখানে অনুপস্থিত।

লেখক প্রথমেই 'আহেরিয়া' উৎসবের সূচনা করে রায় রণমল্লের চণ্ড বিরোধিতা, তার জিঘাংসাবৃত্তি এবং সর্বোপরি প্রতিহিংসা-পরায়ণতার চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। নাটকে রণমল্লের চণ্ডবিরোধিতার দ্বিবিধ কারণ উল্লিখিত হয়েছে—রণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করার ব্যাপারে অসম্মতিজ্ঞাপন এবং সর্বোপরি রণমল্লের চিতোর অধিকারে অন্তরায়-স্বরূপ চণ্ডের চিতোর রাজ্য শাসনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। রণমল্লের ভাষায়:

> গিয়েছিনু সমর্পিতে হৃদয়ের হার,
> স্নেহের অমিয়ধার বালারে আমার!

এই প্রতি-উপকার? এই তার ফল?
প্রাণান্ত গরল দিলিরে হৃদয়ে ঢালি!
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া, পিতা হয়ে তার,
ছিঁড়িয়া হৃদয়-হার স্নেহ-লতিকায়
সঁপেছি বৃদ্ধের করে।

(১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য; পৃঃ ২-৩)

এবংবিধ উক্তি থেকে স্বতঃই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সুগভীর অপত্যস্নেহই বুঝিবা রণমল্লকে চণ্ড-বিরোধিতায় প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু রণমল্লের চণ্ড-বিরোধিতার মুখ্য কারণ অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়েছে—বলাবাহুল্য সেই কারণ হল—তার ন্যায়নীতি বিগর্হিত সীমাহীন প্রলোভন। রণমল্লের ভাষায়ঃ

আশা ছিল মনে, দুহিতা রতনে
হেরিয়া চিতোরাসনে জুড়াব হৃদয়।
সেইসূত্র ধরি, হরি চিতোর-কেতন,
দলিব চরণ তলে। পরে ভুজবলে,
রাঠোরের সনে, বাঁধি শিশোদী-সন্তানে,
নব-শক্তি করিব রচনা।.........
......তুই তার দৃঢ় অন্তরায়।
জেনো চণ্ড! রাঠোরের প্রচণ্ড প্রতাপ
প্রতিহত নাহি হবে, বলে, কি কৌশলে।

(১ম অঙ্ক; ১ম দৃশ্য; পৃঃ ৩)

বাস্তবিক, রণমল্লের মুখে বারেকের জন্য কন্যা স্নেহের কথা ধ্বনিত হলেও তার সেই স্নেহদুর্বল পিতৃ-হৃদয়ের সামান্যতম পরিচয়ও নাটকে প্রকাশিত হয় নি। বরং সমস্তপ্রকার মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিসর্জন দিয়ে রণমল্লকে নিজ দৌহিত্র বালক রানা মুকুলের প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হতে দেখা গেছে। লেখক টডের বর্ণনানুসরণেই রণমল্লকে চিত্রিত করেছেন লক্ষ্য করা যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মিথ্যা চক্রান্ত, মিথ্যাচরণ, কামুকতা রণমল্লের চরিত্রটিকে ঘৃণ্য ও উপহাসাস্পদ

করে তুলেছে। রণমল্লের মৃত্যুর বর্ণনায় লেখক কিঞ্চিৎ স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'রাজস্থানে'র বর্ণনানুযায়ী রণমল্ল আপন কন্যার কোন এক পরিচারিকার ওপর বলপ্রয়োগে তার পাশবী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছিলেন, জঘন্য কামপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তার অমূল্য সতীত্ব হরণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা রমণী রণমল্লকে তারই উষ্ণীষ উন্মোচিত করে শয্যার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে এবং শেষ পর্যন্ত শত্রু-সৈন্যের দ্বারা তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু আলোচ্য নাটকে মদিরা, অহিফেন এবং তদপেক্ষা গুরুতর প্রেমের মত্ততায় প্রমত্ত কামুক রণমল্লের চিতোরের মধ্যম রাজকুমার রঘুদেবের প্রণয়িনী জাহ্নবীর হাতে মৃত্যুবরণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। নাটকে টডের অনুসরণে চিতোর রাজমাতা সখী কমলাকে রণমল্লের প্রণয়িনী-রূপে অভিহিত করা ছাড়াও ব্রহ্মদেবের পালিতা কন্যা জাহ্নবীর প্রতিও রণমল্লের আসক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

চণ্ডের দ্বিতীয় সহোদর রঘুদেবের দুরাচারী রণমল্লের চক্রান্তে মৃত্যুবরণের বিষয় 'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে। তবে 'রাজস্থানে' উল্লিখিত হয়েছে রণমল্ল প্রেরিত সম্মানসূচক রাজবেশ পরিধান করার সময়ে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু নাটকে বিষ-মিশ্রিত পরিচ্ছদ পরিধানের ফলেই রঘুদেবের মৃত্যু ঘটেছিল দেখা যায়। তদুপরি রণমল্লের পরিবর্তে বালক রানা মুকুল কর্তৃক রঘুদেবের কাছে পরিচ্ছদ প্রেরিত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে—

উপহার মুকুলের প্রীতি-উপহার,
অবশ্য পরতে হবে, আমি প্রজা তাঁর,
নহিলে যে অপমান হইবে রাণার।

(৪র্থ অঙ্ক ; ২য় দৃশ্য ; পৃঃ ১২০)

বালক রানা মুকুলের পক্ষে চিতোররাজ্য চণ্ড দক্ষতার সঙ্গে শাসন করতে থাকায় চণ্ডের প্রতি রাজমাতার বিতৃষ্ণা শেষপর্যন্ত চণ্ডের স্বেচ্ছানির্বাসনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে চণ্ডের প্রতি

রাজমাতার বিতৃষ্ণার কারণ স্বরূপ মুখ্যত চণ্ড কর্তৃক তাকে বিবাহ করার ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপনের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হওয়ায় রাজমাতার চণ্ড বিরোধিতা আরও অনেক বেশি সার্থক হয়ে উঠেছে। আলোচ্য নাটকে সেই মনস্তাত্ত্বিক কারণটি অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। যাইহোক, রাজমাতার চণ্ড বিরোধিতা এবং সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে তার থেকে উদ্ধার লাভের জন্য পুনরায় চণ্ডের কাছে রাজমাতার সহায়তা প্রার্থনা এবং চণ্ডের চাতুর্যে চিতোর উদ্ধারের বিবরণ 'রাজস্থান' অনুসরণেই রচিত। বালক মুকুলকে প্রমোদ উদ্যানে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং কুমার অজিতের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে তার জীবন রক্ষার বৃত্তান্তটি সম্পূর্ণ অভিনব সংযোজন। রাজকুমার চণ্ডের বীর্যবত্তা, কর্তব্য পরায়ণতা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, ঔদার্য এবং সর্বোপরি নির্লোভ আচরণ ও অপূর্ব রণনৈপুণ্য 'রাজস্থান' অবলম্বনেই চিত্রিত।

সে যুগের প্রচলিত রীতি অনুসরণে নাটকটিতে বেশ কয়েকটি সঙ্গীত সংযুক্ত হয়েছে। সংযোজিত সঙ্গীতগুলির কয়েকটিতে রামপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রযুক্ত সঙ্গীতটিতে রামপ্রসাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

মনরে আপন কাজ ভুলো না।
(ও তুই) আপন ভুলে সব খোয়ালে (আর)
বিষয় বলে বিষ খেওনা।
যা দর রে তুই ভাবিস আপন, রিপু
দু'জন নয় আপনা,
(তারা) সময় পেলে দেবে ফেলে ঘোর অকূলে
কূল পাবি না।

পুনরায় ৩য় অঙ্কে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের প্রভাব সুস্পষ্ট :

যেমন কর্ম তেমন ফল দেখতে গেলেন চোখে,
সুখ থাকতে নাকে ভাত, মর বলটু ঠুকে।

(বাবা) চোখেতে কি দেখা যায় ? দেখতে হবে কানে,
চুন দিতে হয় কপালেতে, নুন খেতে হয় পানে,
(আর) পরের মুখে ঝাল খেতে হয় নিজের মুখে ভাত
রাজার বাড়ী নজর ভাগী ইয়া ক্যাবাৎ ক্যাবাত।

(৩য় অঙ্ক ; পৃঃ ৯৫)

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মিনী' নাটকটি ১৩২২ সনে প্রকাশিত। যাত্রার জন্য রচিত পালা বলে এই নাটকে সঙ্গীতের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাটকে সম্রাট আলাউদ্দীনের চরিত্রকে বড় হীন করে দেখান হয়েছে। পদ্মিনীর অনিন্দ্য-সুন্দররূপে মোহগ্রস্ত আলাউদ্দীনকে উন্মত্তের মত আচরণ করতে দেখা গেছে। এমন কি সামান্য দাসীর পায়ে ধরে সম্রাটকে বলতে দেখা গেছে—

বাঁদি বাঁদি পায়ে ধরি তোর
সত্য কি ভুবনে তেমন রাণী নাই ?
বল ভাই

দাসীর সঙ্গে আলাউদ্দীনকে অত্যন্ত নিম্নস্তরের রহস্যালাপ করতে দেখা গেছে। আলাউদ্দীনকে দিল্লীর সম্রাটের পরিবর্তে আত্মমর্যাদা-বোধহীন, ব্যক্তিত্ব হীন এক অতি নিম্নস্তরের জীব বলে মনে হয়।

নাটকটিকে অহেতুক দীর্ঘ করার জন্যে নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক এবং নাট্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত বিষয়ের অনাবশ্যক সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মণসিংহ এবং ভীমসিংহের অধঃপতিতরূপ প্রকাশিত হয়েছে। ভীমসিংহ অম্লান বদনে পদ্মিনীকে আলাউদ্দীনের হাতে সমর্পণের সম্মতি প্রদান করেছেন। অপরপক্ষে বীর্যবত্তাহীন লক্ষ্মণকে বাল্যবন্ধুর মাধ্যমে ক্ষত্রিয় সম্মান রক্ষায় অনুপ্রাণিত হতে দেখা গেছে। কুলমর্যাদা রক্ষা অপেক্ষা রাজ্য তথা স্বার্থরক্ষাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দর্পনে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দর্শনের জন্য প্রাসাদে উপস্থিত সম্রাটের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনের আধিক্য বড়ই দৃষ্টিকটু। দর্পণে পদ্মিনীর আলোকসামান্যারূপ দর্শনে মুগ্ধ সম্রাটের অপ্রকৃতিস্থ আচরণ হাসির উদ্রেক করে।

আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মিনীর আত্মসমর্পণের ছলনাকে সত্যজ্ঞানে পদ্মিনীর প্রতি ভীমসিংহের আচরণ কিঞ্চিৎ অভিনব। জীবানন্দের কারণে-অকারণে দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা নাটকীয়তা সৃষ্টির অন্তরায় স্বরূপ। নাটকটিতে সর্বোপরি কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারিত হয়েছে। পদ্মিনী লাভের আশায় আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ, দর্পণে পদ্মিনীর রূপ প্রত্যক্ষকরা, কৌশলে ভীমসিংহকে বন্দী করা, পদ্মিনীর কৌশলে ভীমসিংহের মুক্তিলাভ, প্রচণ্ড যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মেবারের পরাজয় এবং কঠিন জহরব্রতে পদ্মিনীর আত্মবিসর্জনের ঘটনা সকল 'রাজস্থান' অবলম্বনেই রচিত। অপরপক্ষে কৃষ্ণাকে অপহরণ করতে প্রয়াসী হওয়ায় মানসিংহের কৃষ্ণার কাছ থেকে সম্মতি আদায়ের প্রয়াস, দামোদরজী এবং অভিজিৎসিংহের প্রয়াসে কৃষ্ণার মুক্তিলাভ—এ সবই লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

নিশিকান্ত বসুরায় রচিত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'বাপ্পারাও'। নাটকটির প্রকাশকাল ১৩২২ বঙ্গাব্দ। মুখ্যতঃ জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায়তা করার অভিপ্রায়েই লেখক 'বাপ্পারাও' নাটকটি রচনা করেছিলেন।

লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'বাপ্পারাও প্রণয়নে মহাত্মা টডের রাজস্থানই আমার প্রধান অবলম্বন।'

টডের অনুসরণে লেখক বাপ্পারাও সম্পর্কিত প্রচলিত জনশ্রুতি প্রকাশের প্রলোভন সংবরণ করতে পারেন নি। গোরক্ষনাথ কর্তৃক বাপ্পাকে দ্বিধারযুক্ত তরবারি প্রদানের বিষয়টি টডের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ঝুলন পূর্ণিমার দিনে শোলাংকী রাজকুমারীর সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে বাপ্পার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর রাজসমীপে উপস্থিত হওয়া ও নিজের বিবাহ সম্পর্কে উল্লেখ করে রাজকন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্যোগে বাধাদান—লেখকের নিজস্ব কল্পনা।

সেলিম কর্তৃক শোলাংকী রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থনা, অস্বীকার করায় বীরনগর রাজ্য আক্রমণ ও বীরসিংহের মৃত্যুবরণ, বাপ্পা কর্তৃক

রাজকুমারীর সেলিমের হাত থেকে রক্ষালাভ, বাপ্পার কাছে সেলিমের পরাজয় বরণ, সেলিমের কন্যাকে আশ্রয়দানের জন্য ইয়াজিদের চিতোর আক্রমণ—সবই লেখকের নিজস্ব সংযোজন।

নাটকে বর্ণিত হয়েছে ইয়াজিদের সঙ্গে বাপ্পা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইয়াজিদের খড়্গাঘাত বাপ্পার মন্ত্রপূত দেহে না লাগলেও বাপ্পার খড়্গাঘাতে ইয়াজিদ মৃত্যুবরণ করেছে। বাপ্পা সেলিম-কন্যা নোসেরার পাণিগ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ বাপ্পাকে বিষমিশ্রিত সন্দেশ খাইয়ে হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েও ব্যর্থ হয়েছেন, এমনকি তিনি নিদ্রিত বাপ্পাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে বাপ্পা এরপর চিতোররাজ মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন; কিন্তু মানসিংহ নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন এবং পরিণামে বাপ্পা চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। টড মানসিংহের প্রতি বাপ্পার চরম অকৃতজ্ঞতার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানসিংহ বাপ্পার হত্যাসাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন এমন তথ্য প্রদত্ত হয়নি।

নারায়ণচন্দ্র বসু রচিত 'হামির' নাটকটি ১৩২২ সনে প্রকাশিত। নাটকটি মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে উৎসর্গীকৃত। লেখক নাটকটি রচনার প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণ 'রাজস্থান' থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। অজয়সিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অরিসিংহের বিবাহের কাহিনী, অজয়সিংহ কর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরকে মেবারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন, হামির কর্তৃক মুঞ্জা ডাকাতের হত্যাসাধন, হামিরের মালবদেবের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ, অজয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অজিমসিংহের কৈলবারায় মৃত্যুবরণ, মালবদেবের অনুপস্থিতিকালে হামির কর্তৃক চিতোর বিজয়ের ঘটনা—প্রভৃতি সকলই টডের বর্ণনানুসরণে রচিত। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে লেখকের স্বাধীন সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মুঞ্জার কন্যা লছমি ও হামিরের মধ্যেকার অনুরাগ সৃষ্টির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এমন কি, নাটকে হামিরের ইচ্ছানুযায়ী লছমির রাজা অজয়সিংহকে আক্রমণ করা থেকে মুঞ্জাকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসও বর্ণিত হয়েছে।

টডের বর্ণনায় অজয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র আজিমসিংহের কৈলবারায় মৃত্যুর কথা জানা যায় মাত্র। আলোচ্য নাটকে আজিমের কৈলবারায় মৃত্যুর বিষয়টি বর্ণিত হলেও এ ব্যাপারে লেখক কিঞ্চিৎ স্বাধীন কল্পনার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিরস্ত্র হামিরকে হত্যা করতে উদ্যত আজিম, হামিরের প্রতি অনুরক্তা মুঞ্জা-দুহিতা লছমির অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে।

'রাজস্থানে' মালদেব কর্তৃক হামিরের সঙ্গে তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহদানের প্রসঙ্গটি বর্ণিত হলেও এই ব্যাপারে মালদেবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষয়ে কিছু উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু নাটকে হামিরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত মালদেব সম্রাট আলাউদ্দীনের কোপানল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ভবিষ্যতে হামিরের বিরোধিতার সম্ভাবনাকে তিরোহিত করতেই নিজ কন্যার সঙ্গে হামিরের বিবাহ-দানের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মালদেবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছে।

মালদেব দুহিতার হামিরকে চিতোর আক্রমণে উত্তেজিত করার ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা নাটকে বর্ণিত হয়েছে, 'রাজস্থানে' তা অনুপস্থিত। মালদেবের পুত্র হরিসিংহ এবং গ্রহাচার্যের হামিরের পুত্র সন্তানকে দেবতার উদ্দেশে বলিদানের হীন ষড়যন্ত্র রচনার বিষয়টিও লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

মালদেব তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিবাহ রাত্রেই বৈধব্যদশাপ্রাপ্ত কন্যার সঙ্গে হামিরের বিবাহ দিতে মনস্থ করলে তাঁর অন্যতম কর্মচারী জাল মেহেতার এই প্রসঙ্গে বিরোধিতা এবং বিধবা বিবাহের অনৌচিত্য বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা—

'বৎসরান্তে খান দুই সামান্য বস্ত্র আর দিনান্তে একমুষ্টি তণ্ডুলকণায় বিনিময়ে হিন্দু বিধবা ভারতের সমাজ, ধর্ম, ইহকাল, পরকাল, নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা

করে থাকে। রোগে শুশ্রূষা, শোকে সহানুভূতি, দারিদ্র্যে করুণা, ক্ষুধায় অন্ন দিতে হিন্দু-বিধবার মত আর কোথায় কে আছে মহারাজ? জাতীয় কল্যাণের জন্য নিজের সমস্ত ত্যাগ করে, কঠোর ব্রতাবলম্বনে হিন্দু-বিধবা স্বোপার্জ্জিত ধর্মবলে এই জাতিকে, এখনও বলীয়ান করে রেখেছে। এই কল্যাণময়ী দেবী প্রতিমাকে ধ্বংস করে নিজের ও জাতির সর্বনাশ ডেকে আনবেন না, মহারাজ।'

(৩য় অঙ্ক ; পৃঃ ৩৮)

—সাধারণভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থনপুষ্ট বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধীদের সোচ্চার কণ্ঠের প্রতিফলন ঘটেছে বলা যেতে পারে।

নাটকের সংলাপ স্থানে স্থানে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছে। কিছু দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে—

(ক) স্তব্ধ-প্রকৃতির সুষুপ্তি তিরোহিত হয়ে জড়চৈতন্যের কি বিরাট স্ফুরণ একবার দেখ দেবী!......শান্তিময়ী আজ ষট্‌চক্র ভেদ করে বিকশিত সহস্রারে অধিরূঢ়া প্রচণ্ডারূপিনী! পবিত্র শিশোদীয় বংশের দূষিত রক্ত মোক্ষণের জন্য তর্জ্জনি সঞ্চালনে আদেশ করছে। (২য় অঙ্ক ; পৃঃ ৫৭)

(খ) বহু বহু প্রলয়ের ঝড়, কম্বিকরাকারে ঝড় অবিশ্রান্ত বরষার ধারা স্তূপীকৃতা কৃষ্ণাকাদম্বিনী গাঢ় অন্ধকারে এই করালরূপিনী নৈশাকাশ ঢেকে রাখ! ক্ষণপ্রভার অট্টহাস্যে উন্মাদিনী তমিস্রাকে আরও বিভীষিকাময়ী কর। (২য় অঙ্ক ; পৃঃ ৬০)

(গ) উপরে নক্ষত্রবিমণ্ডিত মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশ, নিম্নে কৈলবাগার ঊষর ক্ষেত্রে হিংসা-দ্বেষ-জিঘাংসা—নির্নিক্ত এই শিশোদীয় শব। আর সম্মুখে এই পিতৃশোকে মুহ্যমানা নারীমূর্তি মেবার হিতার্থে প্রতিহিংসা বিসর্জন দিয়ে পিতৃহন্তার সহায়তায় আগুয়ান! (২য় অঙ্ক ; পৃঃ ৬২)

নাটকের সংলাপগুলি ক্ষেত্রবিশেষে অতিশয় দীর্ঘ হওয়ায় নাটকীয় রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে লেখক ক্রিয়াপদগুলিকে প্রচলিত রীতিতে ব্যবহার না করে ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে প্রয়োগ করে সংলাপগুলিকে ছন্দোময় করে তুলেছেন লক্ষ্য করা যায়—

কাহেরকে ভয়? বজ্রমুষ্টে তরবারি ধরে দুর্জয় অরাতি দলে কতবার

করেছি সংহার! ছিন্নমুণ্ড কবন্ধ সঙ্কুল রণস্থলে আজীবন করেছি বিহার! অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষুর বিকৃত চিৎকার বীণার ঝঙ্কার সম শুনেছি শ্রবণে! স্তূপাকার শবের উপরে দাঁড়াইয়ে প্রফুল্ল নয়নে মৃত্যুলীলা কতবার করেছি দর্শন!

(৫ম অঙ্ক; পৃঃ ১৫৯)

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'হামির' নাটকটি নারায়ণ চন্দ্রের ঐ একই নামে প্রকাশিত নাটকের সমসাময়িক। প্রমথনাথের নাটকটিও ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। এটি লেখকের রচিত দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক। নাটকের 'পরিচয়ে' লেখক নাটকটির মূল আখ্যানাংশ স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করেছেন।

নারায়ণ চন্দ্রের 'হামির' নাটকে অজয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিতোর সিংহাসন লাভে বঞ্চিত আজিম সিংহকে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে হামিরের বিরোধিতা করে মৃত্যু বরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু প্রমথনাথের নাটকে আজিম সিংহের অকাল মৃত্যুর বিষয়টি বর্ণিত হলেও তার প্রতিহিংসা বিষয়ে কিছু উল্লিখিত হয় নি।

প্রমথনাথের নাটকে হামিরের সঙ্গে মালদেবের বিধবা কন্যার বিবাহের প্রসঙ্গটি নিতান্ত স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই একই বিষয়কে নারায়ণ চন্দ্রের নাটকে বিস্তৃততর অংশ অধিকার করতে দেখা গেছে।

পাঁচশত সৈন্যসহ হামিরের বরবেশে চিতোরে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি 'রাজস্থানে' সমর্থিত হলেও বিবাহ করতে উপস্থিত হামির কর্তৃক নিতান্ত আকস্মিকভাবে চিতোর আক্রমণের বিবরণ লেখকের কল্পনা প্রসূত এবং কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকও বটে। যাইহোক, শেষপর্যন্ত হামির বিজয়ী হয়েছেন এবং চিতোর তাঁর করতলগত হয়েছে। আলোচ্য নাটকে হামিরের চিতোর বিজয়ের কাহিনীটি 'রাজস্থানে'র ঘটনাকে অনুসরণ না করে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কারণ 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে বিবাহের পরবর্তীকালে মালদেবের অনুপস্থিতির সুযোগে হামিরের চিতোর বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল।

নারায়ণ চন্দ্রের তু'নায় প্রমথনাথের নাকটটিতে লেখকের কাল্পনিক ঘটনা সংস্থান বিস্তৃততর পরিসরে পরিব্যাপ্ত। বিশেষতঃ মুঞ্জার পালিতা কন্যা ময়নার প্রতি আসক্ত মুঞ্জারই প্রতিপালিত ব্যর্থপ্রেমিক রঞ্জনের প্রতিহিংসা চরিতার্থতার প্রয়াস নাটকে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। নাটকটির ঐতিহাসিক আখ্যানের গুরুত্ব কাল্পনিক আখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

লেখক নাটকের 'পরিচয়' অংশে বলেছেন,

'নাটকের প্রকৃত সার্থকতা মানব প্রকৃতি উদ্ঘাটন করিয়া মানব প্রকৃতিতে অজ্ঞাতে সরস সদ্ভাবরাশি সঞ্চারিত করা। শুধু লোমহর্ষণ ঘটনা, কবিত্বছটা, ভাষার সমারোহ, সাময়িক উত্তেজনা বা উন্মাদনার ইন্ধন যোগাইলেও সাহিত্যের জীবন-যুদ্ধে টঁকিতে পারে না। টিঁকিবে তাহাই যাহা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অন্তর্জগতের কঠিন সমস্যা গুলির সমাধানে সক্ষম; যাহা দেশ-কাল-পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়; সমগ্র ম নবজাতির চিরন্তন মানবিকতাকে আশ্রয় করিয়া আছে'

—নাটকের নানা স্থানেই লেখকের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারমুখিতা প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করায় রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রেমের জয়গান, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, নারীত্বের প্রকৃত আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা ও মন্তব্য নাটকের সর্বত্রই লক্ষিত হয়ে থাকে।

রাণী অবন্তীর চরিত্রে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট আলাউদ্দীনের কাছে উপস্থিত জনৈক অমাত্যকে 'সাহেব' বলে সম্বোধন (৫ম অঙ্ক, পৃঃ ১৪২ – ১৪৩) কিঞ্চিৎ অস্বস্তির সৃষ্টি করে। সংলাপে প্রায়শঃই প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়।

'রাণাসঙ্গ' নাটকটি ধূর্জটি অধিকারী রচিত এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। মূলতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাই' নাটকে সঙ্গের চিতোর লাভের পূর্ববর্তী যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার পরবর্তী ঘটনা-সমূহ অবলম্বনেই আলোচ্য নাটকটি রচিত। মোটামুটিভাবে নাটকে

উপস্থাপিত ঘটনারাজি টডের অনুসরণেই রচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কিঞ্চিৎ রূপান্তরও লক্ষ্য করা যায়।

চিতোরের সিংহাসনের অধিকার লাভ প্রসঙ্গে রায়মল্লের তিন পুত্র-সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্লের বিরোধ পরিবর্তিত রূপে নাটকে উপস্থাপিত। নাটকে মুখ্যতঃ জয়মল্লকে সিংহাসনলোভী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। টডের বর্ণনায় কিন্তু দেখা যায় উদ্ধত স্বভাবের অধিকারী পৃথ্বীরাজই চিতোর সিংহাসনে অগ্রজ সঙ্গের দাবী স্বীকারে বিশেষভাবে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু নাটকে লেখক জয়মল্লকেই এইরূপ মানসিকতার অধিকারী রূপে উপস্থিত করেছেন। শুধুমাত্র তাই নয়, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে জয়মল্লকে হীন চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করে দেখান হয়েছে। লেখক নিজেই ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে, পৃথ্বীরাজকে তিনি সোদরানুরাগী রূপে চিত্রিত করেছেন।

টডের বর্ণনায় চারণী সমীপে পৃথ্বীরাজ ও খুল্লতাত সূর্যমল্লের মধ্যেকার ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে সূর্যমল্ল, সঙ্গ এবং পৃথ্বীরাজের মধুরতর সম্পর্কের কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের পরিণয়ের বিবরণ, রায়মল্লের জামাতার চক্রান্তে বিষক্রিয়ায় পৃথ্বীরাজের মৃত্যুবরণ, শূরতানের কন্যা তারাবাইয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বলপ্রয়োগে অধিকার করতে গিয়ে শূরতান অধিপতির হাতে জয়মল্লের অকাল মৃত্যু বরণ প্রভৃতি ঘটনা 'রাজস্থানে'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সঙ্গের সমর নৈপুণ্য, রণনীতি, অষ্টাদশ যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ, দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করা - সকলই টডের বর্ণনানুগত। এমনকি কনুয়ার যুদ্ধে বাবরকে পরাজিত করার বিষয়টিও 'রাজস্থান' অবলম্বনেই রচিত। শেষপর্যন্ত শিলাইদির বিশ্বাস ঘাতকতায় সঙ্গের পরাজয় বরণের সমর্থনও 'রাজস্থানে' মেলে। তবে 'রাজস্থানে' শিলাইদিকে 'শিলাদিত্য' রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

রায়মল্লের সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে লেখক নাটকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিবরণ প্রদান করেছেন। বলা হয়েছে উদারচেতা ভ্রাতৃবৎসল সূর্যমল্লের অনুকম্পাতেই তিনি চিতোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এইরূপে রায়মল্লকে অতিশয় দুর্বলচেতা রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি স্বকীয় বিক্রম ও ক্ষমতা প্রভাবেই রানা কুম্ভের সিংহাসনে সমাসীন হয়েছিলেন। সিংহাসন লাভের পূর্বে তাঁকে পিতৃহন্তা উদোর বিরুদ্ধে অসি পর্যন্ত ধারণ করতে হয়েছিল।

নাটকে সূর্যমল্ল চরিত্রটিকেই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। লেখক নিজেও এটা স্বীকার করেছেন। 'রাজস্থানে' সূর্যমল্লকে অতিশয় কুটিল, চতুর এবং সিংহাসন লোভী রূপে দেখা গেছে। এমন কি স্বীয়স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে মালবপতি মজাফরের সহায়তা পর্যন্ত গ্রহণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু নাটকে সূর্যমল্লকে সিংহাসন লোভীর পরিবর্তে ভ্রাতৃবৎসল, ন্যায়পরায়ণ, মহাবীর রূপেই চিত্রিত করা হয়েছে।

প্রিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অরিসিংহ' নাটকটি ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। অরিসিংহের রাজত্বকালে চিতোরের যে শোচনীয় দুরবস্থা নাটকে রূপায়িত হয়েছে, তার সমর্থন 'রাজস্থানে' মেলে। রাজ্য মধ্যে অন্তর্বিপ্লব, প্রজাবর্গের একতা বিনষ্ট হওয়ার বিবরণও 'রাজস্থানে' বর্তমান।

অরিসিংহকে যে দুর্বলচেতা রূপ নাটকে উপস্থিত করা হয়েছে, তাও 'রাজস্থান' অবলম্বনেই। বাস্তবিক, চিতোর সিংহাসনের যোগ্য ছিলেন না তিনি। 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বার্ষিক ত্রিংশৎ সহস্র টাকার ভূমিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন এবং ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দারগণের অন্তর্ভুক্ত। নাটকে মুখ্যতঃ বিলাসী, অলস ও স্ত্রৈণ অরিসিংহের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের অসন্তোষ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'রাজস্থানে'র বর্ণনানুযায়ী অরিসিংহের অবৈধভাবে রাজ্যাধিকার নিবন্ধন

অধিকাংশ সর্দার তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। কথিত আছে যে, অরিসিংহ নাকি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রাজসিংহকে অন্যায় ভাবে হত্যাপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। নাটকেও সর্দারগণের অরিসিংহ-বিরোধিতার কারণস্বরূপ এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। তবে সর্বোপরি রতন সিংহের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে অরিসিংহের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত করেছিল— নাটকের বর্ণনায় তাই দেখা যায়।

রতন সিংহের জন্মবৃত্তান্ত 'রাজস্থানে'র বর্ণনানুগত। রাজসিংহের ঔরসে গোগুণ্ডা সর্দারের দুহিতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। অরিসিংহের বিরোধী পক্ষের - মাধোজী সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা এবং এক ক্রোর পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রদানের শর্ত 'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে। জালিম সিংহের বীরত্ব, মহত্ত্ব, তেজস্বিতা ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় 'রাজস্থান' অবলম্বনেই চিত্রিত। মন্ত্রী অমরচাঁদের ভূমিকাটিও 'রাজস্থান' অনুসরণে রচিত। কিন্তু অমরচাঁদের পদচ্যুতির কারণ প্রসঙ্গটি লেখক কল্পিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মেবারের ঘোরতর বিপদের সময় পুনরায় অমরচাঁদের আত্মপ্রকাশ ও মেবার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ-সকলই টডের বর্ণনানুগত।

অরিসিংহের স্ত্রী অঞ্জনার, স্বামীর অজ্ঞাতে গোপন কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব সংযোজন। চরিত্রটির অসম্ভব ক্রিয়া-কলাপ চরিত্রটিকে অবাস্তব করে তুলেছে।

মেবারের দুর্দিনে রানা অরিসিংহের সহায়তা করার ব্যাপারে অমরচাঁদের আরোপিত শর্তাদি 'রাজস্থান' অনুসরণেই রচিত। রতন সিংহের মাধোজী সিন্ধিয়াকে তার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টিও 'রাজস্থান' থেকেই গৃহীত। 'আহেরিয়া' মহোৎসবে রাজকুমার অজিত কর্তৃক অরিসিংহকে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনাটি 'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে। অরিসিংহের উপপত্নী কর্তৃক তাঁর মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন ও ঐ একই চিতায় উপপত্নীর প্রাণ বিসর্জনের বিষয়টিও 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত। 'রাজস্থানে'

অবশ্য বর্ণিত হয়েছে যে অরিসিংহের হত্যাকাণ্ডের পর সকলেই তাঁর শবদেহ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং একমাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর উপপত্নী। কিন্তু নাটকে বর্ণিত হয়েছে অন্ত্যেষ্টির সময় উপস্থিত ছিলেন অনুগত রাজপুত সর্দার ও ভীল সর্দারগণ।

মণীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'রাণা সংগ্রাম সিংহ' নাটকটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলি সবই লেখকের স্বকপোলকল্পিত। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে বাবর, হুমায়ুন, আলম খাঁ, সংগ্রাম সিংহ, রত্নসিংহ, শিলাইদি (তুয়ার বংশীয় সামন্তরাজ ও মেবার সেনাপতি), রায়মল (মারবার রাজপুত্র) ঐতিহাসিক চরিত্র।

নাটকটি ফতেপুর সিক্রীর যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত। যখন পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে নিহত করে বাবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন আর্যাবর্তে রানা সংগ্রাম সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিরূপে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বাবর এইজন্য সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। রানা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের দুটি যুদ্ধ হয় প্রথম যুদ্ধে বাবর সংগ্রামের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং নির্ধারিত হারে বার্ষিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়ে অধিকৃত রাজ্য প্রত্যর্পণে সম্মত হয়ে সন্ধি করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে শিলাইদির বিশ্বাসঘাতকতায় রানা পরাজিত হন। টডের গ্রন্থে এই স্বজাতি বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক শিলাইদি অবশ্য শিলাদিত্য' নামে উল্লিখিত হয়েছে। অম্বর রাজকুমার বাহারমলের বাবরের সঙ্গে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং সম্রাটের অধীনে পাঁচ সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ বিষয়ে নাটকে বর্ণিত হলেও, এই বিষয়টি কিন্তু টডের গ্রন্থে অনুপস্থিত। রাজকুমার রত্নের সঙ্গে অম্বর রাজকুমারীর প্রণয় ইতিহাসমূলক। লেখক অবশ্য এই প্রণয়কাহিনীকে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন এবং কৌশলে

নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। লেখক ভূমিকায় বলেছেন,

"সংগ্রাম সিংহের মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈত রহিয়াছে, আমি মহাত্মা টড্ সাহেবের মত অবলম্বন করিয়াছি।"

অম্বর রাজমহিষী রমাবাঈ, মেবার সেনাপতি শিলাইদি, অম্বর রাজকুমার বাহারমল, যুবরাজ রত্নসিংহ প্রভৃতির সংলাপ স্থানে স্থানে অহেতুক অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে বক্তৃতার অনুরূপ হয়েছে।

আজমীর দুর্গাধিপতি করিমচাঁদের সংলাপের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অভিমত উচ্চারিত হয়েছে।

'আর এক অপরাধ তারা মানবের স্বাধীনতা কেড়ে দিয়ে অধীনতার বজ্রশৃঙ্খলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধতে চায়।' (২য় অঙ্ক; পৃঃ ৪৯)

নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'মেবার গৌরব' নাটকটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৩২৭ সনে। তবে এটি নাট্যাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত ২য় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। নাটকটি সংগ্রাম সিংহের জীবন অবলম্বনে রচিত। নাটকটির স্থানে স্থানে অবাস্তব ঘটনার সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বর্ণিত সংগ্রাম সিংহের মহিষী কর্তৃক কারারক্ষীকে পিস্তলের গুলিতে হত্যাসাধন পূর্বক কারারুদ্ধ ভ্রাতাকে মুক্তিদান কিংবা বিক্রমজিৎকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে মুঘলের সঙ্গে রানার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার মত ঘটনাগুলি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

নাটকে সংগ্রাম সিংহের চরিত্র একটু অভিনব ভাবে চিত্রিত হয়েছে। রানার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য দেখান হয়েছে অসহায় মুঘল সৈন্যদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে নিশ্চিত জয়লাভের সুযোগ সত্ত্বেও সংগ্রাম সিংহ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর পরিসমাপ্তি ঘোষণার পরও যুদ্ধ করায় পুত্র রত্নসিংহকে এবং অম্বরাধিপতি পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। অসহায়, রণক্লান্ত সম্রাট বাবরকে দ্বিতীয়বার আক্রমণে বিলম্ব করতে সম্মত

হয়েছেন, কিংবা আশ্রিত রহমত খাঁকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নিরস্ত্র জয়মলকে হত্যায় উদ্যত শিলাদিত্যকে প্রতিহত করতে অসিহস্তে কন্যা মীরার আবির্ভাব এবং জগমলকে সহায়তা করার বিষয়টিও অবাস্তব। পিতা শিলাদিত্য ও পুত্রী মীরার মধ্যেকার সংঘর্ষের বিষয়টিও (চতুর্থ অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য) অত্যন্ত হাস্যকর।

শিলাদিত্যের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির পরামর্শে বাবরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিচালিত হওয়ার বিষয়টিও স্বাভাবিক নয়। লেখক নাটকে সর্বাপেক্ষা অবাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রানার শ্যালক শিলাদিত্যকে।

আলোচ্য নাটকটি যে 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। রাণাসংগ্রাম কর্তৃক শ্রীনগরের করিমচাঁদকে আজমীরের ভূমিবৃত্তি প্রদান, তদীয় পুত্র জগমলকে চান্দেরী জয় করার জন্য 'রাও' উপাধি প্রদান—সবই টডের অনুসরণে বর্ণিত। লেখকের নিজস্ব কল্পনার পরিচয়ও নাটকটির নানাস্থানেই বিদ্যমান। বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত সংগ্রামের অজ্ঞাতবাসের বিবরণ 'রাজস্থানে' বর্ণিত হলেও লেখক এর কারণ স্বরূপ সংগ্রামের গুরুর নির্দেশকে অভিহিত করেছেন। আশ্রিতকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার কারণেই বাবরের সঙ্গে সংগ্রামের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি নাটকের এই বিবরণের সমর্থন কিন্তু 'রাজস্থানে' মেলেনা। বলাবাহুল্য যে রানার চরিত্র মাহাত্ম্য বৃদ্ধিকল্পেই লেখকের এরূপ সংযোজন।

শিলাদিত্য প্রদত্ত বিষমিশ্রিত জলপানে মহারাণার মৃত্যুর বিবরণও কাল্পনিক। সংগ্রামের মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্রকে চিতোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে কনিষ্ঠা রাণীর বাবরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার বিবরণ 'রাজস্থানে' ও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নাটকে প্রথমাবধিই এই ষড়যন্ত্র বর্ণিত। রাজপুত কলঙ্ক শিলাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় 'রাজস্থানে' বর্ণিত হলেও নাটকে তাকে ভিন্নতর পরিচয়ে রূপান্তরিত হতে দেখা গেছে।

পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত 'রাণাকুম্ভ' নাটকটি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত এবং ১৩২৯বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন,'রাণাকুম্ভ রাজস্থান অবলম্বনে লিখিত।' টডের গ্রন্থ ব্যতীত লেখক ফেরিস্তা এবং লেনপুলের 'মিডিভাল 'ইণ্ডিয়া' থেকেও নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তবু লেখকের নিজেব ভাষায, 'অধিকাংশ চরিত্র ও ঘটনার রাজস্থানে উল্লেখ আছে।'

নাটকটি চিতোব তথা ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং সর্বোপরি টড সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। নাটকটির প্রধান চরিত্র রাণাকুম্ভ; এতদ্ব্যতীত কুম্ভ-পত্নী মীরাবাই. কুম্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র উদো (উদয়), কনিষ্ঠ পুত্র বায়মল্ল প্রভৃতি চরিত্রগুলি টডের অনুসরণেই চিত্রিত। কুম্ভের ভগ্নী লালবাই, খীচিসর্দার, চাচা ও মৈব চরিত্রগুলিও 'রাজস্থান' সূত্রেই সংগৃহীত। টডের গ্রন্থে রাণাকুম্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র 'উদো' নামে উল্লিখিত হযেছে। কিন্তু নাটকে শ্রুতিমাধুর্যের জন্য লেখক প্রায়ই 'উদয়' নামটি ব্যবহাব করেছেন

মীরার অলৌকিক কৃষ্ণভক্তি, মালবরাজের সঙ্গে কুম্ভের বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, 'ঝুনঝুনু' নামক স্থানে দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে মালবরাজের কুম্ভকে সহায়তা দান, জ্যেষ্ঠকুমার উদো কর্তৃক মহারাণা কুম্ভের হত্যাসাধন—সকলি টডের বর্ণনানুগত।

নাটকে চাচা ও মৈবেব বিরোধিতার বিষয়টি বর্ণিত হলেও টডের গ্রন্থে এই বিরোধিতার মনস্তাত্ত্বিক কারণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঝালাবার কুমারীকে হরণপূর্বক তাকে রানা কুম্ভের বিবাহ করার ঘটনাটিও 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত। নাটকটিতে বিদ্যাপতি রচিত একাধিক পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ রচিত 'মিবার কুমারী' নাটকটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এবং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে উৎকর্গীকৃত। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, 'মিবারকুমারী' ঐতিহাসিক নাটক, সুতরাং মাধ্যমত এই নাটকে ইতিহাসের তথ্য ঠিক রাখিতে

চেষ্টা করিয়াছি। তবে নাটক লিখিতে যেটুকু স্বাধীনতা লইতে পারা যায়, তাহা বাধ্য হইয়া লইয়াছি কারণ গত্যন্তর নাই।'

নাটকটির বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে টডের 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত। এই একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে মাইকেল মধুসূদন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) রচনা করেছিলেন তেষট্টি বৎসর আগে। কিন্তু নাটকীয়তার বিচারে এবং ঐতিহাসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র গুণগত উৎকর্ষ 'মিবারকুমারী' অপেক্ষা যে বহুলাংশে অধিক, তা বলা বাহুল্য মাত্র। নাটকে চিত্রিত ভীমসিংহ, জয়পুর অধিপতি জগৎ সিংহ, মানসিংহ, সর্বোপরি কৃষ্ণার চরিত্র টডের বর্ণনানুসরণে উপস্থাপিত করা হলেও চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা অন্তর্হিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবালুতা এবং অলৌকিকতা চরিত্রগুলিকে নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর করে তুলেছে।

টডের অনুসরণে কৃষ্ণাকে অপরূপ রূপময়ী রূপে বর্ণনা করা হলেও তার কৃষ্ণপ্রেমিক রূপ—নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনার পরিচয় বাহী। টডের বর্ণনায় কৃষ্ণার যে দার্শনিক মানসিকতা এবং পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশিত, আলোচ্য নাটকে তা অনুপস্থিত।

কৃষ্ণার অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জনের প্রয়াস টডের বর্ণনা বহির্ভূত। তবে মধুসূদনের নাটকে যেমন কৃষ্ণাকে খড়গাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেছে, আলোচ্য নাটকে লেখক টডের অনুসরণে কৃষ্ণার বিষপানে মৃত্যুবরণের কথাই উল্লেখ করেছেন।

নাটকে ভীমসিংহকে কাপুরুষ ও অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রভূত পরিমাণ অর্থলাভের বিনিময়ে তিনি জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ দানে মনস্থির করলে মানসিংহ কৃষ্ণার পাণি প্রার্থীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। একদিকে জগৎ সিংহকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা অপর পক্ষে আশা হত মানসিংহ কর্তৃক মেবারের ধ্বংস সাধনের সম্ভাবনা—রানা শেষ পর্যন্ত সত্য রক্ষার্থেই কৃত সঙ্কল্প হয়েছেন। যুদ্ধ ভয়ে ভীত রানার স্বহস্তে কৃষ্ণা, স্বীয় পত্নী ও

পুত্রকে হত্যার প্রয়াস লেখকের স্বাধীন সংযোজন। জয়পুরের জগৎ সিংহ চরিত্রটিকে টডের অনুসরণেই কামুক ও লম্পটরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। জগৎসিংহের কৃষ্ণার বিবাহে অন্তরায় সৃষ্টি কারিণী রূপে জগৎ সিংহের মহিষী 'রঞ্জাবতী'র যে প্রয়াস নাটকে বর্ণিত হয়েছে, সেটি লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

লেখক ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রচলিত ধারা অনুসরণের পরিবর্তে তাঁর নাট্য রচনায় কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন বলে দাবী করেছেন। তাঁর ভাষায়,

'এ দেশের—এই ভারতের যাহা প্রাণ, সেই ভক্তিভাবের সমাবেশ করিতে কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছি। যে নাটক পাঠক ও দর্শকগণের কেবল চিত্তরঞ্জন না করিয়া তৎসহ চিত্তকে অতীন্দ্রিয়ের পথে কিছুমাত্র পরিচালিত না করে, তাহা নিষ্ফল।'

বস্তুত পক্ষে ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনায় লেখক আধ্যাত্মিকভাবের কৃত্রিম সংযোজনে নাটকের রসাভাস ঘটিয়েছেন স্বীকার করতে হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ রচিত 'পান্না' নাটকটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। লেখক যে নাটকটির বিষয়োপকরণ টডের গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন, তার প্রমাণ 'সঙ্কেতে' লেখকের স্বীকারোক্তি। বস্তুত নাটকটি রচনায় লেখককে বিশ্বস্তভাবে টডের বর্ণনার অনুসরণ করতে দেখা গেছে

বিক্রমজিৎ উদয়সিংহ, বনবীর, পান্না, ডুনগারপুরের শ্রাবক জৈন পুরোহিত), শাসনকর্তা ঐশকর্ণ, উদয় সিংহের আশ্রয়দানকারী আশা শাহ্ প্রমুখ চরিত্রগুলি 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত।

জননীর নির্দেশে আশা শা'র অসহায় ও বিপন্ন উদয়কে আশ্রয় দান পান্না কর্তৃক স্বীয় সন্তানের জীবনের বিনিময়ে উদয়ের জীবনরক্ষা, বিশ্বস্ত হৃদয় হিতাকাঙ্ক্ষী ভিলগণের সহায়তায় বালক উদয়সহ পান্নার কমলমীর দুর্গে উপনীত হওয়া, আশাশাহের স্বর্গীয় পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় ভবনে অনুষ্ঠিত ভোজের অনুষ্ঠানে বালক উদয়ের

তেজস্বিতা প্রদর্শন, শনি গুরুসর্দারের কন্যার সঙ্গে গিহেলাট বংশীয় উদয়ের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বিবরণ, বনবীরের দুহিতার যৌতুকস্বরূপ কচ্ছ প্রদেশ থেকে প্রেরিত বহুমূল্য পণ্য সম্ভার সহস্র ঘরোয়াল রক্ষককে পরাজিত করে উদয়ের বিবাহে সেগুলির ব্যবহার—শালুম্ব্রাধিপতি সহিদাস, কৈলবাধিপতি জগ, বাগোরের অধীশ্বর সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ প্রমুখ মেবারের সামন্ত রাজন্যবর্গের উদয়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও উদয়কে সিংহাসন লাভে সাহায্যদান—সকল ঘটনা রাজিই টডের বর্ণনানুগত।

বনবীরের জন্মবৃত্তান্তও টডের বর্ণনানুসরণে রচিত। টডও বলেছেন বনবীরের জননীর নাম ছিল শীতল সেনী এবং তিনি ছিলেন দাসী বনবীরের চরিত্রটিও মোটামুটি ভাবে 'রাজস্থান' অনুসরণেই চিত্রিত। টডের অনুসরণেই লেখক সিংহাসন লাভের পূর্ব বনবীরের ঔদার্য ও বদান্যতাকে সিংহাসন লাভের পর পরিবর্তিত করে স্বার্থপর, লোভী ও নীচাশয় ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। তবে বনবীরের পরিণামটি লেখক পরিকল্পিত। 'রাজস্থানে' তাকে উন্মাদ হতে দেখা যায় নি। লেখক এক্ষেত্রে **'Poetic Justice'** এর খাতিরে তাকে উন্মাদরূপে চিত্রিত করেছেন। শীতলসেনীর প্রভাবকে বনবীরের হীন আচরণের কারণ রূপে যে নাটকে বর্ণনা করা হয়েছে, তাও লেখক কল্পিত।

'রাজস্থানে' বনবীরের কন্যার ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে তেমন কিছু উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু আলোচ্য নাটকে তার এক উজ্জ্বল ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বনবীরের কন্যার বিবাহ রাতে উদয়ের পক্ষাবলম্বন-কারীদের চিতোর আক্রমণের পরিকল্পনাটিও লেখকের নিজস্ব কল্পনা প্রসূত। উদয় সিংহের চরিত্রটি 'রাজস্থানে'র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'রাজস্থানে' ও তাঁকে দুর্বল চিত্তের ব্যক্তিরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। বনবীরের মন্ত্রীবরের বনবীরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও উদয়ের পক্ষ সমর্থনের বিষয়টিও টডের বর্ণনানুগত। বনবীরের পক্ষ সমর্থনকারী দু'জন সর্দারের বিষয় 'রাজস্থানে'ও উল্লিখিত হয়েছে। 'রাজস্থানে'

এদের একজনের নাম 'মালোজি' বলে বর্ণিত হলেও দ্বিতীয়জনের নাম কিন্তু অনুচ্চারিত থেকে গেছে। লেখক প্রথম জনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাটকে দ্বিতীয়জনকে 'মাহোলী' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই দু'জন সর্দারের পরিণতি—একজনের উদয় সিংহের পক্ষ সমর্থনকারীদের হাতে মৃত্যুবরণ এবং অপরজনের উদয়ের আনুগত্য স্বীকার টডের অনুসরণেই রচিত।

প্রফুল্লময়ী দেবী রচিত 'ধাত্রীপান্না' নাটিকাটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। নাটিকাটি মাত্র পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিকে লেখিকার অক্ষম প্রয়াস বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ধাত্রীপান্নার অপূর্ব আত্মত্যাগের বিষয়টিই গ্রন্থে মুখ্যতঃ বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বিক্রমজিতের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, বনবীরের রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু লেখিকা টডের 'রাজস্থান' থেকে প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'রাজস্থানে' দেখা যায় আশাশাহের আশ্রিত কুমার উদয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তাঁকে ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবর্তে ভাগ্নে বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নাটিকাটির সংলাপ মূলতঃ গদ্যে রচিত হলেও মাঝে মাঝে কাব্যে রচিত সংলাপের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল মোনেম রচিত 'মেবার মিলন' নাটকটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। 'সম্মিলনী' ও 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠাতা এবং 'তুরস্ক বিপ্লব' ও 'বিবাহ' প্রণেতা আব্দুল মোনেম রচিত 'মেবার মিলন' নাটকটি পঞ্চম দৃশ্যে সমাপ্ত। এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিতে যুবরাজ অমর সিংহের চরিত্রটিকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেলিম কর্তৃক অমরকে আশ্রয়দান এবং মানসিংহের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষার বিষয়টি অভিনব। নাটিকাটিতে 'রাজস্থানে'র তেমন বিশ্বস্ত অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় না।

এ পর্যন্ত আলোচিত এই সমস্ত অপ্রধান নাটকগুলির নাটকীয়

সিদ্ধি বা রস সার্থকত' খুব উচ্চমানের নয়। তবে সাহিত্যের ইতিহাসের সামগ্রিক এবং পূর্ণ মালোচনার প্রয়োজনে এইসব নাটকের বিচার ও উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই সঙ্গে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে একজন বিদেশীয়ের ইতিহাসকল্প রোমান্টিক কাহিনী বাঙ্গালীর চেতনাকে কতদূর পর্যন্তই না আকর্ষণ করেছিল। রোমান্টিক প্রিয়তা, নিখাদ জাতীয়তা বোধ এবং দেশানুরাগ বাঙ্গালীকে পাত্রাপাত্র বা বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করতে দেয়নি। যে কোনো উপাদানকে অবলম্বন করেই তা আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। বিশেষ করে পরাধীনতার বাইরে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলা—এই যেখানে মৌল আকাঙ্ক্ষা, সেখানে গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখা সব সময় হয়ত সম্ভব হয়নি, তবুও একটা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ও মানসিক ইসিহাস গড়ে তোলার কাজে এগুলির ভূমিকা যতটুকু বিবেচিত হয়েছে, ততটুকুতেই এইসব অপ্রধান নাটকগুলির সাফল্য। আর সেখানেই এগুলির যথার্থ মূল্য।

পাদটীকা

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃঃ ১৪১

২. বাংলা নাটকের ইতিহাস; ডঃ অজিতকুমার ঘোষ; ৫ম সংস্করণ; পৃঃ ১৪৯।

৩. Introduction : Annals & Antiquities of Rajasthan (L K. Addy's Edition ; 1876 ; Page 10)

৪. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 368

৫. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 370

৬. নাট্যকার শ্রীমধুসূদন ; ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ; পৃঃ ২৫৮

৭. Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XVII ; Page 326

৮. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 327

৯. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 327

১০. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 371
১১. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 371
১২. Ibid ; Vol I ; Chap XXVII ; Page 558
১৩. Ibid ; Vol I ; Chap XXVII ; Page 558
১৪. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 371
১৫. কৃষ্ণকুমারী (অলোক রায় সম্পাদিত ; ১৩৭০) পৃ: ৩৪
১৬. Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XVII ; Page 371
১৭. Ibid ; Vol I ; Chap XVII ; Page 372
১৮. 'I do not believe a word of the story about the alleged accidental self-poisoning in any of its forms, although it is true that Akbar, like many European Princes of his time, did remove several of his enemies by secret assassination, probably using poison in certain cases. On the whole, while it is perhaps most probable that Akbar died a natural death, the general belief that he was poisoned in some fashion by some body may have been well-founded. The materials do not warrant a definitive judgement.'

Akbar the great Mogul ; Vincent A Smith ; Chap XI ; Page 326

১৯. Annals & Antiquities of Rajasthan , Vol I ; Chap XII ; Page 285
২০. Ibid ; Vol I ; Chap XII ; Page 285
২১. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 282
২২. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 281
২৩. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 229
২৪. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 229
২৫. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 230
২৬. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 231

২৭. Ibid ; Vol I ; Chap ; VII ; Page 231

২৮. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 231

২৯. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 271

৩০. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 272

৩১. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 272

৩২. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 274

৩৩. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 270

৩৪. Ibid ; Vol I ; Chap VI ; Page 220-221

৩৫. আর্য্যদর্শন ; (১২৮২) ; যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত।

৩৬. 'প্রতাপসিংহের ভূমিকা যথাসম্ভব ইতিহাসানুগত'—ড. সুকুমার সেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; পৃঃ ২৯৮।

৩৭. Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XI ; Page 283

৩৮. ১লা অক্টোবর, ১৯০১-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভারত মিত্র' পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত।

৩৯. দ্রষ্টব্য ৩৭নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৪০. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 278

৪১. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 276

৪২. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 276

৪৩. 'the Ahairea is therefore called the Mahoorut ca sikar, or the chase fixed astrologically. As their success on this occasion is ominous of future good, no means are neglected to secure it, either by scouts previously discovering the lair, or the desperate efforts of the hunters to slay the boar when roused. With the sovereigr and his sons all the chiefs sally forth, each on his best steed, and all animated by the desire to surpass each other in acts of powers and dexterity'.

—Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XXI ; Page 449

৪৪. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 278

৪৫. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 278-279

৪৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ; ড. সুশীল রায় ; পৃঃ ১৫০

৪৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ২য় খণ্ড (৫ম সংস্করণ) ; ড. সুকুমার সেন ; পৃঃ ৩৬৮

৪৮. দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃঃ ৭৫৪

৪৯. Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap VIII ; Page 242

৫০. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 2 4

৫১. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 245

৫২. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 271

৫৩. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 272

৫৪. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 272

৫৫. নাটকে এই অর্থের পরিমাণ বলা হয়েছে বিংশতি সহস্র সেনার চৌদ্দ বৎসরের বেতনের সমান। কিন্তু 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছেন—'equivalent to the maintenance of twenty-five thousand men for twelve years.' (Vol I ; Chap XI ; Page 281)

৫৬. 'on one occasion they were saved by the faithful Bhils of cavah, who carried them in wicker baskets and concealed them in the tin mines of Jawura, where they guarded and fed them.'

(Vol I ; Chap XI ; Page 277)

৫৭. নাটকে মানা কর্তৃক প্রতাপের মস্তকস্থিত উষ্ণীষ গ্রহণের কথা বর্ণিত হলেও 'রাজস্থানে' রাজচ্ছত্র গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

৫৮. Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ;Chap XI ; Page 280

৫৯. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 281

৬০. দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ; রথীন্দ্রনাথ রায় ; পৃঃ ২৮৬

৬১ বাংলা নাটকের ইতিহাস ; (৫ম সংস্করণ) ; ড. অজিতকুমার ঘোষ ; পৃঃ ২৭৮

৬২. Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XIII ; Page 306

৬৩. Ibid ; Vol I ; Chap XIII ; Page 307-308

৬৪. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ; ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ; পৃঃ ৩১১

৬৫. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XIII ; Page 313-314

৬৬. Ibid ; Vol I ; Chap XIII ; Page 306

৬৭. Ibid ; Edited by C H. P. Vogel

৬৮. Ibid ; Vol I ; Chap XII ; Page 296

৬৯. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ; ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ; পৃঃ ৩১৯

৭০. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XII ; Page 287

৭১. Ibid ; Vol I ; Chap XII ; Page 286

৭২. ১৯০৩

৭৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস ; (৫ম সংস্করণ) ; ড. অজিতকুমার ঘোষ ; তৃতীয় অঙ্ক ; পৃঃ ৩০৪

৭৪. Annals & Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap VI ; Page 219

৭৫. Ibid ; Vol I ; Chap VI ; Page 219

চতুর্থ অধ্যায়

টডের 'রাজস্থান' ও বাঙ্গালা কাব্য

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে বাঙ্গালায় বহু সংখ্যক নাটক ও উপন্যাস রচিত হলেও সে পরিমাণে কিন্তু কাব্য ও কবিতা রচিত হতে দেখা যায় নি। অথচ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'রাজস্থান' অবলম্বনে বাঙ্গালা সাহিত্যে রচিত প্রথম গ্রন্থটিই একটি কাব্য। কাব্যটির নাম 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যটি রচিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। মঙ্গলকাব্য ভারাক্রান্ত মধ্যযুগীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যাঁকে জেহাদ ঘোষণা করতে দেখা গেল, তিনি যুগ সন্ধিক্ষণের কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ই সর্বপ্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রতিফলিত। বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের ধারায় তাই 'অন্নদামঙ্গল' একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। অন্নদামঙ্গলের পরবর্তী যে কাব্যগ্রন্থটি বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন, সেটি নিঃসন্দেহে আমাদের আলোচ্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। এই কাব্যটি রচনায় রঙ্গলাল চারণ কবির ভূমিকা পালন করেছেন। তাই সাহিত্যিক মূল্যের কথা বাদ দিলেও বিশেষত স্বাদেশিক সাহিত্য রচনার ইতিহাসে 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র এক উল্লেখযোগ্য স্থান সর্বজনস্বীকৃত।

গ্রন্থের ভূমিকায় কবি গ্রন্থরচনার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কুন্তীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের অনুরোধেই তিনি টডের গ্রন্থানুসরণে এই কাব্যগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। কবির ভাষায় —

'আমি উভয়োক্ত মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম।'

কবি তাঁর কাব্যে বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে কেন 'রাজস্থানে'র বিষয়কে নির্বাচিত করলেন, সে প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ দান করে বলেছেন :

'এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষত ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের উত্তাবৎ শ্রদ্ধাই নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুবর্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান কালাবধি বর্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এদেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুনালঙ্কারে রাজপুতেরা যে রূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।'

—অর্থাৎ নিছক রস-চর্চার পরিবর্তে প্রধানত স্বাদেশিক চেতনার বশবর্তী হয়েই যে কবি রাজপুত কাহিনীকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু রূপে নির্বাচিত করেছিলেন, সে বিষয়টি এখানে সুপরিস্ফুট। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

'প্রাচীন যুগের বীরত্ব ও ঐতিহ্য জ্ঞাপন ইতিকথাকে কাব্যের কথাবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া রঙ্গলাল বাংলা সাহিত্যের একটা নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। প্রাচীন অতীতের গৌরব কাহিনী একদিকে যেমন সহজেই পাঠককে বিমোহিত করিয়া জাতীয়তাবোধে প্রেরণা দেয়, তেমনি অতীতের ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত এই কাহিনী গুলি এক অপরূপ রোমান্স-রস পরিবেশন করিয়া চিত্তকে রসাবিষ্ট করে।' ১

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যানটির আকর্ষণ ও বৈচিত্র্য বিষয়ে প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুবিশাল 'রাজস্থান' গ্রন্থ বহুবিধ চরিত্র এবং বৈচিত্র্যময় আখ্যানের আকর স্বরূপ। কিন্তু তবু তন্মধ্যে এমন দু'একটি চরিত্র এবং ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা একাধিক কারণেই বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এইজন্য এই সকল চরিত্র ও আখ্যান অবলম্বনে একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেছে পদ্মিনীর উপাখ্যান 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত এমনই এক আকর্ষণীয় বিষয় যা একাধিক কারণেই লেখকদের করেছে আকৃষ্ট।

অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রাজা ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর প্রতি সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রলোভন এবং তাঁকে লাভের আশায় নিজ শিবিরে আগত বৃদ্ধ রাজার প্রতি সম্রাটের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা; অতঃপর পদ্মিনী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে কিরূপে রাজাকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সে কাহিনী কেবল চিত্তাকর্ষকই নয়, সেই সঙ্গে বিস্ময়করও বটে। এরপর প্রতারিত সম্রাট প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য চিতোর আক্রমণ করলে চিতোর রক্ষার জন্য রাজপুতগণ সর্বস্ব পণ করে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হলে পদ্মিনীসহ সকল ক্ষত্রিয় রাজপুত রমণী কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে প্রাণ বিসর্জন দেয়। বাস্তবিক, চিতোর রক্ষার ব্যাপারে রাজপুত বীরগণের বীরত্ব রাজপুতানার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর সেই সঙ্গে কঠিন জহরব্রতের ন্যায় গাম্ভীর্যময় ও বিষাদ ভারাক্রান্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা পদ্মিনীর উপাখ্যানকে করে তুলেছে অধিকতর আকর্ষণীয়। এইজন্যই কবিবর রঙ্গলাল এবং পরবর্তীকালে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিশেষভাবে পদ্মিনীর উপাখ্যানকেই তাঁদের কাব্য ও নাটকের বিষয়বস্তু রূপে নির্বাচন করেছিলেন।

অবশ্য পদ্মিনী আখ্যানের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে পরবর্তীকালে

যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হীরাচাঁদ ওঝা, ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা এই আখ্যানের সত্যতায় দৃঢ়ভাবে অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। কালিকারঞ্জন তো স্পষ্টই বলেছেন :

'আমাদের মনে হয়, পদ্মিনী উপাখ্যানের উৎপত্তি স্থান মেবারভূমি নয়, অযোধ্যা প্রদেশ যেখানে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সী এই কাব্য রচনা করেন।'[২]

কালিকারঞ্জনের আরও অভিমত হল—

'আমাদের মনে হয়, মধ্যদেশের রতন সেন নামে কোন রাজার পদ্মিনী স্ত্রী বিষয়ক কোন কাহিনী অযোধ্যায় প্রচলিত ছিল। মুসলমান কবি উহাকে মুসলমান ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদের কাঠামোতে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন।... ইতিহাসে পদ্মিনী রাণীকে খোঁজা বৃথা।'

তবে কবিবর রঙ্গলাল যখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনায় ব্রতী হন, তখন টডের গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে তেমন কোন সংশয় প্রকাশের অবকাশ ছিল না।

রঙ্গলাল তাঁর কাব্যের সূচনাতেই টডের বর্ণনানুসরণে পদ্মিনী-আখ্যানটি স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করে নিয়েছেন—

তের শত একত্রিশ সম্বৎ বৎসরে।
করিত লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনোপরে॥
কুমার লক্ষ্মণ নহে প্রাপ্ত ব্যবহার।
রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার॥
যাঁর প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা।
রূপে, গুণে জ্ঞানে, অবনীতে অনুপমা॥
যাঁহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি।
চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি॥
রাজ্য লোপ, বংশ লোপ, প্রাপ্ত হয় তায়।
ব্যান-মাতা রাক্ষসীর ক্ষুধার জ্বালায়॥
তথাপি পদ্মিনী সতী সতীত্ব রতন।
না দিলেন যবনেরে, করি প্রাণপণ॥
অতুলিত রূপ, গুন, সতীত্ব সহিত।
অর্পিলেন অগ্নিগ্রাসে রাখিতে স্বহিত॥

'Lakumsi succeeded his father in S. 1331 (A D. 1275), a memorable era in the annals, when che tore, the repository of all that was precious yet untouched of the arts of India, was stormed, sacked, and treated with remorseless barbarity, by the Pathan emperor, Alla—o—din.

Bheemsi was the uncle of the young Prince, the protector during his minority. He had espoused the daughter of Hamir Sank (chohan) of ceylon, the cause of woes unnumbered to the Sesodias. Her name was Pudmini, a title bestowed only on the superlatively fair, and transmitted with renown to posterity by tradi ion and the song of the bard. Her beauty, accomplishments, exaltation, and destruction with other incidental circumstances constitute the subject of one of the most popular traditions of Rajwara.' [৪]

ঐতিহাসিকেরা যাঁরা পদ্মিনীর আখ্যানে বিশ্বাসী, তাঁরা কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ করেছেন যে, পদ্মিনী আসলে রতন সিংহের পত্নী, তিনি মোটেই ভীমসিংহের পত্নী নন। ভাটদের গ্রন্থে সমর সিংহের পর রতন সিংহের নাম অনুল্লিখিত থাকায় টড পদ্মিনীকে ভীমসিংহের পত্নীরূপে বর্ণনা করেছেন। পদ্মিনীর পরিচয় সম্বন্ধে 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে যে তিনি ছিলেন সিংহলের চৌহান বংশীয় রাজা হামিরশঙ্কের দুহিতা। কবি রঙ্গলালও তদনুযায়ী 'পদ্মিনী বর্ণন' অংশে পদ্মিনীর পিতৃ পরিচয় ও ভীমসিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। অথচ চিতোরের রাজা লক্ষ্মণ সিংহের সমসাময়িক সিংহলরাজ ছিলেন চতুর্থ প্রকরম বাহু।

টড আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের কারণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন—

'The Hindu bard recognizes the fair, in preference to

fame and love of conquest, as the motive for the attack af Alla-o-din, who limited his demand to the possession of Pudmini, though this was a long and fruitless seize.' [৫]

রঙ্গলালকেও বর্ণনা করতে দেখা গেছে—

পদ্মিনী রূপের যশ, পরিপূর্ণ দিক দশ,
শ্রুতমাত্র দুরন্ত যবন।
না শুনিল কার মানা, সিংহপুর দিল হানা
সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন ॥

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের এবংবিধ কারণকে অস্বীকার করে থাকেন। ঐতিহাসিক হাজীউদ্দাবীর চিতোর অবরোধের পূর্বে অথবা রাণীর বন্দী হবার পরবর্তীকালে পাদ্মিনীর প্রতি আলাউদ্দীনের দাবী জানান বিষয়েই নিশ্চিত নন। চিতোর অবরোধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে অধৈর্য সম্রাট শেষ পর্যন্ত ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে দর্পণে দেখার প্রস্তাব দিলেন—

'At length he restricted his desire to a mere sight of this extraordinary beauty, and acceded to the proposal of beholding her through the medium of mirrors.'[৬]

কাব্যে কিন্তু বর্ণিত হয়েছে যে পদ্মিনীই স্বয়ং সম্রাটের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার পরিবর্তে কুলমর্যাদা রক্ষাকল্পে দর্পণের মাধ্যমে সম্রাটকে দর্শন দানের প্রস্তাব করেছেন :

সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায় ;
হবে তবে কুলে কালি।
দেখুক দর্পণে, ছায়া দরশনে,
বংশেতে না রটে গালি ॥

টড সম্রাট আলাউদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন :

'The Rajpoot unwilling to be out done in Confidence accompanied the king to the foot of the fortress, amidst

many Complimentary excuses from his guest at the trouble he thus occasioned. It was for this that Alla risked his own safety, relying on the superior faith of the Hindu. Here he had an ambush; Bheemsi was made prisoner, hurried away to the Tatar camp, and his liberty made dependent on the surrender of Pudmini' ৭

আলোচ্য কাব্যেও সম্রাটের এই বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে—

দুরন্ত পাঠান পতি পেয়ে তাঁরে করে।
সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বদ্ধ করে॥

এরপর সম্রাটের উক্তিতে বলা হয়েছে :

অতএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল।
পদ্মিনীরে এনে দাও রাখ মন বোল॥
সব দিক রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিবে যাবে সমর অনল॥

ভীমসিংহের বন্দী হবার পর পদ্মিনী শেষ পর্যন্ত নিতান্ত চাতুর্য-সহকারে সম্রাটের সঙ্গে দিল্লী যাবার ছলনায় ছদ্মবেশী সেনানীদের নিয়ে শিবিকাসহ যাত্রা করে ভীমসিংহকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে আনলেন। কবি টডের বর্ণনানুসরণে কাব্যে সেই চমকপ্রদ কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে বন্দী রানা স্বয়ংই তাঁর মুক্তির পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। টডের বর্ণনায় কিন্তু বলা হয়েছে পদ্মিনী তাঁর খুল্লতাত গোরা এবং গোরার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সঙ্গে পরামর্শ করেই রানাকে মুক্তির পরিকল্পনা করেছিলেন। এমনকি টডের বর্ণনায় পদ্মিনী সাতশটি শিবিকাসহ সম্রাটের শিবিরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন বলে উল্লিখিত হলেও ঐতিহাসিক হাজিউদ্দাবীর এই সংখ্যা পঁচিশ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ফেরেস্তা অবশ্য শিবিকার সংখ্যা সাতশ বলেই উল্লেখ করেছেন।

কবি রঙ্গলাল কাব্য রচনার সময়ে স্বীয় অভিপ্রায় বর্ণনা প্রসঙ্গে

বলেছেন যে অলৌকিকত্ব বর্জন করে বাংলা কাব্যের প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী যুবকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে তিনি প্রয়াসী। কিন্তু বাস্তবত কাব্য রচনাকালে কবিকে অলৌকিকতা পরিহার করতে দেখা যায়নি। বরং কালীমূর্তির আবির্ভাব, দৈববাণী শ্রবণ প্রভৃতির ন্যায় ঘটনাগুলির মধ্যদিয়ে অলৌকিকতাকেই প্রকাশ করতে দেখা গেছে—

"একদা ক্ষণদা-গতে, আলস্য নয়ন-পথে,
কহিলে পলক দ্বাররোধ।
দেখিলেন কালীমূর্ত্তি, স্তম্ভ হতে্য পেয়ে স্ফুর্ত্তি,
কহিতেছে বচন সক্রোধ॥
"শুন ভীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর,
যদি ক্ষুধা নিবার আমার।
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরি, দেরে খাদ্য ত্বরা করি,
নর—মেদ—রক্ত—উপহার॥"
রাজা কন "হে চামুণ্ডে! অগণিত সৈন্য মুণ্ডে,
ক্ষুধা শান্তি না হল্যো তোমার।
আর কি খাইবে কালি? সকলি দিয়াছি ডালি,
রক্ষ রাজ্য হয় ছারখার॥"
দেবী কন "মহাযশ, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ।
পরিতৃপ্ত হব তার, তোমার ঘুচিবে দায়,
যদি রাখ আমার বচন॥
তিনদিন পুত্রগণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদে করিবে বরণ।
ক্রমে—একাদশ জন, প্রাণপণে করি রণ,
মম-গ্রাসে হইবে পতন॥"

কবি এই অলৌকিক কাহিনী লাভ করেছেন টডের গ্রন্থ থেকে। প্রতারিত ও ক্ষুব্ধ সম্রাট চিতোর অবরোধ করার পর টড বর্ণনা করেছেন—

'The poet has found in the disastrous issue of this seize admirable materials for his song. He represents the Rana, after an arduous day, stretched on his pallet, and during a night of watchful anxiety, pondering on the means by which he might preserve from the general destruction one at least of his twelve sons; when a voice broke on his solitude, exclaiming "Myn bhooka ho," (I am hungry) and raising his eyes, he saw, by the dim glare of the cheragh, (lamp) advancing between the granite columns, the majestic form of the guardian goddess of cheetore. "Not satisfied," exclaimed the Rana, "though eight thousand of my kin were late an offering to "thee?"—"I must have regal victims, and if twelve who "wear the diadem" bleed not for cheetore, the land will pass from the line, "This said, she Vanished.' [৮]

কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে যে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ভীমসিংহ মৃত্যুবরণ করলে অজয়সিংহ পুষ্করে তাঁর শেষকৃত্য সম্পাদন করেছেন এবং তারপর যাত্রা করেছেন ভীলয়ারা প্রদেশে। টডের বর্ণনায় অজয়ের ভীলয়ারা প্রদেশে গমনের বিষয় উল্লিখিত হলেও ভীমসিংহের শেষকৃত্য সম্পাদনের বিষয়টি কবির স্বকল্পিত। আলাউদ্দীনের কাছে চিতোর পরাস্ত হবার পর সহচরী সমভিব্যাহারে পদ্মিনীর জহরব্রতের অনুষ্ঠান কবি টডের অনুসরণেই বর্ণনা করেছেন। মোটের ওপর কাব্যটির অন্য সবকিছু বাদ দিলেও জাতীয়তাবাদ প্রচার ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার ন্যায় মহত্তর কর্তব্য পালনের পরিপ্রেক্ষিতে তথা স্বাদেশিক চেতনার জাগরণে যে এক বিশেষ স্থান আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ন্যায় পদ্মিনীর উপাখ্যান এক বিশেষ আদর্শের বাস্তব রূপ। এই কাব্যে সংযোজিত 'স্বাধীনতা

হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' অংশটি দেশের স্বাদেশিক চেতনার জাগরণে গায়ত্রী মন্ত্রের ভূমিকা পালন করেছে।

পদ্মিনী উপাখ্যানের শেষে কবি বলেছেন—

"শুন হে পথিকবর, সাঙ্গ হলো অতঃপর মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যসুধা, এইরূপ হৃদে ধরি
ধ্যান॥"

'পদ্মিনী-উপাখ্যান' যথেষ্ট আদৃত এবং জনপ্রিয় হবার ফলে কবি রঙ্গলাল স্বভাবতঃই তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে রচনা করেন 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২)। 'কর্ম্মদেবী' রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য। কাব্যটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে উৎসর্গীকৃত। কবি 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে' যেমন রাজস্থানের কাহিনীকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজপুত-নারী পদ্মিনীকে কাব্যের নায়িকারূপে চিত্রিত করেছেন, দ্বিতীয় কাব্যটিতেও অনুরূপ ভাবে রাজস্থান কাহিনীকে গ্রহণ করে অপর এক রাজপুত রমণী কর্ম্মদেবীকে নায়িকা পদে বরণ করেছেন।

মহামতি টড তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

'I will conclude with one displaying the romantic chivalry of the Rajpoot, and the influence of the fair in the formation of character; it is taken from the annals of Jessulmeer, the most remote of the estate of Rajasthan, and situated in the heart of the desert, of which it is an oasis.' [১]

টড এই প্রসঙ্গে যে ঘটনাটি বিবৃত করেছেন, কবি রঙ্গলাল সেই কাহিনীটিকেই চারটি সর্গে বিভক্ত করে 'কর্ম্মদেবী' কাব্যে রূপায়িত করেছেন। টড বর্ণিত কাহিনীটি বাস্তবিকই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। পুগল প্রদেশে ভট্টিজাতির অধিপতি রণঙ্গদেবের পুত্র সাধু ছিলেন মস্তবড বীর ও অসীম সাহসী। তিনি এক সময়ে ঔরিণ্ট নগরীতে মোহিলদের অধিপতি মাণিক রাওয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঔরিণ্টে অবস্থানকালে মাণিক রাও দুহিতা কর্ম্মদেবী সাধুর প্রেমে পড়েন।

এদিকে কর্ম্মদেবী ছিলেন মুন্দোরের রাঠোর ভূপতি-তনয় অরণ্যকমলের বাগদত্তা। কর্ম্মদেবীকে বিবাহ করে নিজ গৃহে যাবার সময় অরণ্যকমলের সঙ্গে সাধুর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সাধু নিহত হন। তখন বিধবা কর্ম্মদেবী তাঁর একটি হাত কুল-কবির কাছে প্রেরণ করেন; অপর হাতটি প্রেরণ করেন শ্বশুরের সমীপে। বলাবাহুল্য কর্ম্মও মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর সাধুর চিতায় নিজদেহ বিসর্জন দেন। কর্ম্মদেবীর স্মৃতিতে একটি জলাশয়ও নির্মিত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে। টডের ভাষায়—

'This encounter took place in S. 1492, A. D 1407.' [১০]

কবি রঙ্গলাল টড বর্ণিত কাহিনীটিকেই আনুপূর্বিক গ্রহণ করেছেন। কেবল ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকটি চরিত্রের নামের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন মাত্র। টড পুগল অধিপতির নাম যেখানে বলেছেন 'রণঙ্গদেব', কবি সেক্ষেত্রে তাঁকে 'অনঙ্গদেব' বলে বর্ণনা করেছেন। টড মোহিল অধিপতিকে 'মাণিক রাও' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু কাব্যে তাঁকে 'মাণিকদেব রায়' বলে বলা হয়েছে।

কবি কাব্যের প্রথম সর্গ আরম্ভ করেছেন এইভাবে—

যশল্মীর অন্তঃপাতী, দেশ ছিল ভট্টিজাতি,
অধীপ অনঙ্গদেব তার।
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধু নামা, বিক্রম-আধার।

টডের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

'Raningdeo was lord of Poogul, a fief of Jessulmeer his heir, named Sadoo, was the terror of the desert.' [১১]

'রাজস্থানে' বর্ণনা করা হয়েছে সাধু এক লুণ্ঠন কার্য সেরে ফেরার পথে ঔরন্ট নগরীতে মানিক রাওয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। টড সাধুর লুণ্ঠন কার্যের বিস্তৃত বিবরণ দেন নি। কেবল বলেছেন সাধু বেশ কিছু উট এবং ঘোড়া লুণ্ঠন করেছিলেন। কিন্তু কবি তাঁর কাব্যে

সাধুর লুণ্ঠনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বলা হয়েছে সাধু জলন্ধরের নিকটে বিপাশা নদীর তীরে অবস্থানরত মুসলমান বণিকদের লুণ্ঠন করেছেন এবং প্রসঙ্গত কবি তাঁর স্বাজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন এইখানে। সাধু বণিকদের আক্রমণের কারণ বিবৃত করে বলেছেন—

অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ।
কে করিল তাহাদের মর্য্যাদা হরণ?
কে করিল নগর নিকর-শোভা নাশ?
তোমরা জান না কি হে সেই ইতিহাস?
যেই দুষ্ট দুঃশয় হরিল এ সব।
তোমরা তাহার জাতি, জ্ঞাতি, গোত্রভব।
হাজার মঙ্গল ব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি।
এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানাদেশে (১ম সর্গ; পৃঃ ৭)

কিন্তু টডের বর্ণনায় এইটুকু মাত্র উল্লিখিত হয়েছে—

'Returning from a foray, with a train of captured camels and horses, he passed by Aureent.' [১২]

ষোড়শী কন্যা কর্ম্মদেবীর সঙ্গে রাঠোর অধিপতি তনয় অরণ্যকমলের বিবাহ স্থির হওয়া সত্ত্বেও কর্ম্মদেবীই যে শেষ পর্যন্ত সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, টড সে কথা বলেছেন—

'Although betrothed to the heir of the Rahtore of Mundore, she signified her wish to renounce the throne to be the bride of the chieftain of Poogul;' [১৩]

কাব্যেও বলা হয়েছে—

অবশেষে হলো স্থির, মন্দারের ভূপতির,
নন্দন সহিত সুসম্বন্ধ।
অরণ্য কমল নাম, কুলের গৌরব গ্রাম,
রাঠোর প্রসিদ্ধ রাজস্থানে।

কর্ম্মদেবী সহ বিভা, প্রেম-পদ্মরাগ নিভা,
দিবানিশি জ্বলে তার প্রাণে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ হেন কর্ম্মদেবীই আসক্ত হলেন সাধুর প্রতি—

দেব—সেনাপতি প্রায়, সাধুর সুন্দর কায়,
তাহে বীর বীর-চূড়ামণি।
সুখী মাত্র শৌর্য্য সুখে, কীর্ত্তি কথা মুখে মুখে,
যশোরসে ভরিল ধরণী।
রূপে গুণে অদ্বিতীয়, এ ছাড়া নারীর প্রিয়,
বল আর হয় কোন্ জন?
ভুলিল মাণিক্য-সুতা প্রেম-অনুরাগ যুতা,
সাধুরে-প্রাপণ মনন।

(২য় সর্গ ; পৃঃ ১০)

সাধু কর্ম্মদেবীর বাসনা অবগত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কর্ম্মকে পত্নীরূপে গ্রহণে স্বীকৃতি জানাননি! তাঁর শর্ত ছিল—

ঔরিণ্ট-ঈশ্বর যদি দেন এই নিধি।
গ্রহণ করিতে পারি যথা শাস্ত্র বিধি।
নতুবা এ কার্য্যে মম অভিমত নয়।
পরিণয়ে পাণিদান উপযুক্ত হয়।

(৩য় সর্গ : পৃঃ ২২)

টডও বলেছেন—

'Sadoo, as a gallant Rajpoot, dared not reject the overture, and he promised "to accept the coco," if sent in form to Poogul.' ১৪

কাব্যে বর্ণিত হয়েছে সাধুর বীর্যবত্তার পরিচয় পেয়ে কর্ম্ম সহচরীর মাধ্যমে সাধুকে মাল্য প্রেরণ করেছিলেন! সাধু লক্ষ্যভেদে জয়ী হয়ে একেবারে ঔরিণ্ট থেকে কর্ম্মকে নিয়ে নিজের গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। এসবই কবির স্বাধীন কল্পনা। 'রাজস্থানে' সাধুর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় জ্ঞাপক কোন বিবরণ প্রদত্ত হয়নি। বিশেষত

বিবাহের প্রাক্কালে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্র অরণ্যকমলের চার সহস্র সৈন্যসহ সাধুর পথরোধ, সাধুর সাহায্যার্থে কর্ম্মের পিতা কর্তৃক সৈন্য প্রেরণ এসবই কবি টডের বর্ণনানুসরণেই লিপিবদ্ধ করেছেন। টড বলেছেন—

'Irrinkowal, the slighted heir of Mundore, determined on revenge, and with four thousand Rahtores planted himself in the Path of Sadoo's return, aided by the Sankla Mehraj, whose son Sadoo had slain.' [১৫]

সাধুর সাহায্যার্থে চারসহস্র সৈন্য প্রেরিত হলেও সাধু তন্মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য গ্রহণ করে অবশিষ্ট সৈন্য গ্রহণে অসম্মত হন এবং স্বীয় শত শত সৈন্যসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে যা কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তাও টডের বর্ণনানুসরণেই—

'Though entreated to add four thousand Mohils to his escort, Sadoo deemed his own gallant band of seven hundred Bhattis sufficient to convey his bride to his desert abode, and with difficulty accepted fifty, led by Megraj, the brother of the bride.' [১৬]

কাব্যে বর্ণিত হয়েছে—

'সমরের সজ্জা ভারী, রাঠোর হাজার চারি,
আসিয়াছে রণমদে মেতে।
তার যোগ্য অনুবল, এনেছে প্রবল দল,
মিহিরজ নাগরিয়া জেতে॥
অতএব যোগ্য হয়, যথা হেন শত্রু চয়,
উপযুক্ত সেনা আয়োজন।
হবে তব অনুকারি, মোহিল হাজার চারি,
সত্বরেতে করিব প্রেরণ (৪র্থ সর্গ; পৃঃ ২৮)

কর্ম্মের পিতার এই ইচ্ছা প্রসঙ্গে সাধুর উত্তর—

যে আছে আমার বল ভট্টি-কুল ভানু-দল,
সপ্ত-শত বিক্রম-কেশরী॥

ইহাই যথেষ্ট হবে, রাঠোর এ ভীমাহবে,
ত্রাণ না পাইবে একজন।
অত্যাজ্য প্রসাদ তব, পঞ্চাশ মোহিল লব,
এইমাত্র মম নিবেদন॥" (ঐ)

সাধুর প্রতিহারী জয়তঙ্গের প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও অরণ্যকমলের প্রতিহারী মিহিরজের কাছে মদিরা প্রার্থনা এবং মিহিরজ কর্তৃক সেই প্রার্থনা পূরণের যে বিবরণ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তারও মূলে রয়েছে টডের বর্ণনা। অবশ্য কাব্যে যে ক্ষেত্রে জয়তঙ্গ কর্তৃক মদিরা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে, টডের বর্ণনায় সেক্ষেত্রে আফিং চাওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে –

'The rivals encountered at chondun, where Sadoo had halted to repose; but the brave Rahtore scorned the advantage of numbers, and a series of Single Combats ensued, with all the forms of chivalry. The first who entered the lists was Jeytanga, of the Pahoo clan, and of the kin of Sadoo. The enemy came upon him by surprise while reposing on the ground, his saddle cloth for his couch, and the bridle of his steed twisted round his arm; he was soon recognized by the Sankla, who had often encountered his prowess, on which he expatiated to Irrinkowal, who sent an attendant to awake him; but the gallant Panch kalyan had already performed this service, and they found him upbraiding white-legs for treading upon him. Like a true Rajpoot "toujours Pret," he received the hostile message, and sent the envoy back with his compliments, and a request for some uml or opium, as he had lost his own supply. With all Courtesy this was sent, and prepared by the domestics

of his antagonist; after taking which he lay down to enjoy Customary siesta.' [১৭]

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সাধুর মৃত্যুবরণ এবং সাধ্বী কর্ম্ম কর্তৃক স্বীয়-হস্তচ্ছেদন পূর্বক একটি কুলকবি সমীপে এবং অপর হস্তটি শ্বশুর সমীপে প্রেরণের বিবরণও টডের বর্ণনানুগত। কবি বর্ণনা করেছেন—

পতি-খর কৃপাণ লইয়ে করে,
স্বীয় বাম বাহুতে প্রহারে॥
ছিন্ন কর ভূষণ সহিত,
সহোদর হস্তে করি সমর্পণ।
কহে, "শুন শুন ভাই,
করিহ পালন মম চরম বচন"
আমাদের কুল—কবিবরে,
দিও এই হস্ত রতন মণ্ডিত।
সতীত্বের সঙ্গীত আখ্যানে ভাই,
গান যেন দাসীর চরিত॥"
অনন্তর ভ্রাতারে কৃপাণ দিয়ে
কহিতেছে বিনত বচন॥
"করবালে ছেদন দক্ষিণ বাহু,
হোক মম সুখেতে মরণ॥
এই হস্ত পাঠাও আমার।
হৃদয়-নাথ-পিতার নিকটে।
জানিবেন এই কথা তিনি ভাই,
বধূ তাঁর সুত যোগ্য বটে॥ (৪র্থ সর্গ; পৃঃ ৩৮)

এইবার টডের বর্ণনার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে—

'With the fall of the leaders the battle ceased; and the fair cause of strife, korumdevi, at once a virgin, a wife, and a widow, prepared to follow her affianced. Calling for a sword, with one arm she dissevered the other, desiring it might be conveyed to the father of her lord—"tell him

such was his daughter." The other she commanded to be struck off, and given, with her marriage jewels thereon, to the bard of the Mohils.' [১৮]

কর্মের স্মৃতিতে জলাশয় নির্মাণের কথা যা কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তারও সমর্থন মেলে টডের বিবরণে —

'a tank was excavated on the spot, which is still called after the heroine, "the lake of korumdevi.' [১৯]

রঙ্গলালের প্রথম কাব্য অধিকতর জনপ্রিয় হলেও তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ কিন্তু 'কর্ম্মদেবী'তেই অধিকতর পরিস্ফুট। কাব্যের নায়ক সাধু চরিত্র মূলত এই আদর্শেই চিত্রিত। ব্যবসা ও চাকুরীসূত্রে কিছু বাঙ্গালী নূতন বড়লোক হয়ে অহঙ্কারী হওয়ায় কবি কাব্যে তাঁদের বেশ আঘাত দিয়েছেন, আঘাত দিয়েছেন বাঙ্গালীর পৌরুষ হীনতাকেও।

কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'কর্ম্মদেবী' কাব্যটি রচনার পর 'শূর-সুন্দরী (১৮৬৮) রচনা করেন। কাব্যটি চারটি সর্গে বিভক্ত। রানাপ্রতাপ সিংহ অশেষ দুর্দশা ভোগের পর শেষ পর্যন্ত সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকারে মনস্থ করলে পৃথ্বীরাজ তাঁকে একটি পত্র কবিতা প্রেরণ করেছিলেন। সেই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই কাব্যটি রচিত। মূলতঃ মহারাণা প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণকারী মহারাজা মানসিংহ প্রতাপ কর্তৃক অপমানিত হলে তারই প্ররোচনায় প্রতাপের বিরুদ্ধে সম্রাট আকবরের সর্বাত্মক অভিযান, প্রতাপ কর্তৃক রাজকুমার সেলিমের জীবন সংশয়, ঝালাপতি মান্না কর্তৃক মুঘল সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত প্রতাপের জীবন রক্ষা, চৈতকের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর প্রতাপের অনুসরণকারী মুঘল সৈন্যদ্বয়কে হত্যা পূর্বক ভ্রাতা শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের জীবন রক্ষা, সেলিমের কাছে প্রথমে প্রকৃত সত্য গোপন করেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সত্য উদঘাটনের পর সেলিম কর্তৃক শক্তসিংহকে মুঘল বাহিনী থেকে বিতাড়ন এবং

প্রতাপের পক্ষে শক্তসিংহের যোগদান বর্ণিত হয়েছে। তবে আলোচ্য কাব্যে সিংহভাগ অধিকার করে আছে সম্রাট আকবর আয়োজিত নওরোজার বিবরণ। এই বিবরণে কবি স্বাধীন কল্পনার স্বাক্ষর রেখেছেন। কৌশলে পৃথ্বীরাজ—মহিষীকে নওরোজায় আনয়ন করে সম্রাট কর্তৃক তার সতীত্ব বিনাশে সচেষ্ট হওয়া এবং শেষপর্যন্ত পৃথ্বীরাজ-মহিষীর সাহসিকতায় তাঁর উদ্ধারলাভ, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। কবি অবলম্বিত বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছিল একাধিক নাটক এবং উপন্যাস। বিশেষত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে এই সব বিষয়েরই রূপায়ণ ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হওয়ায় এখানে সেই একই বিষয়ের আলোচনার পুনরাবৃত্তি করা হল না। মোটামুটিভাবে বলা চলে কবি টডকে অনুসরণ করেই কাব্যটি রচনা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে স্বাধীন কল্পনা প্রকাশের সুযোগ ছিল, সেক্ষেত্রেই কবি তার সদ্ব্যবহার করেছেন। নওরোজার বিস্তৃত বিবরণ দান ব্যতিরেকে কবি তাঁর স্বাধীন কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন মহিষীর অনুপস্থিতিতে রাত্রে পৃথ্বীরাজের নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শনের বর্ণনায়। টডের বর্ণনায় পৃথ্বীরাজ মহিষী নওরোজায় যাবার প্রাক্কালে আপন নিরাপত্তা এবং সতীত্ব রক্ষাকল্পে সঙ্গে ছুরিকা নিয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে কবি এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন লক্ষ্য করা যায়। কবি বলেছেন পৃথ্বীরাজ-মহিষী সম্রাটের অন্তঃপুর থেকে বাইরে নিষ্ক্রমণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিপদাশঙ্কায় দেবী চণ্ডিকার শরণ নেন। এবং দেবী চণ্ডীকাই পৃথ্বীরাজ-মহিষীকে আত্মরক্ষার জন্য তরবারি দান করেন এবং সাহস প্রদান করে বলেন—

সতীত্ব কবচে তোর আবৃত শরীর।
প্রকাশে প্রভার যেন মধ্যাহ্ন-মিহির॥
কার সাধ্য অতিচার করিতে তাহার।
কোন্ তুচ্ছ আকবর যবন-কুমার॥

ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর।
এই লহ তরবারি প্রসাদ আমার॥
হৃদয়ে গোপনে রাখি করহ গমন।
সাহসে নির্ভর মতি দৃঢ় কর মন॥

(শূর সুন্দরী ; ৪র্থ সর্গ)

পরে মহিষী নিশাবসানে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে পৃথ্বীরাজ তাঁর কাছ থেকে আকবরের আচরণের আনুপূর্বিক বিবরণ অবগত হয়ে রানা প্রতাপের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

'রঙ্গলালের প্রতিভায় কল্পনার স্ফূর্তি ছিল কিন্তু দীপ্তি ছিল না। তিনি স্বকীয় কাব্যকলার উপাদান নিজস্ব ভাষা তৈয়ারী করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতিভা নিজের পথ কাটিয়া লইতে পারে নাই।'[২০]
—ডঃ সুকুমার সেনের এই মন্তব্য আমাদের আলোচ্য রঙ্গলালের তিনটি কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই যথার্থ বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'খড়্গ-পরিণয়ে'র উপাদান টডের 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত। প্রথমে এ'টি প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় (চৈত্র ১২৮৬)।

কবিতাটির সূচনায় লেখিকা 'রাজস্থান' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছিলেন।

মেবারের রানা রতন এবং বিখ্যাত সূরজবুন্দি নরপতির চরিত্র চিত্রণে লেখিকা যে টডের অনুসরণ করেছেন তা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। টড তাঁর গ্রন্থে অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজ বালার কোন নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু লেখিকা তাঁর কাব্যে পৃথ্বীরাজ-কন্যার নামকরণ করেছেন অলকা। কাব্যে অপর যে চরিত্রটি সম্পূর্ণ লেখিকার স্বকপোলকল্পিত সেটি হ'ল চপলা চরিত্র। এই চরিত্রটি যে কেবল কবির নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি তাই নয়, কাব্যে চরিত্রটিকে অত্যন্ত জীবন্ত দেখা গেছে।

টড মেবারের রানা রতনের সঙ্গে পৃথ্বীরাজ দুহিতা অলকার গোপন

বিবাহের কোন কারণ নির্দেশ করেননি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কাব্যে লেখিকা এর একটি বিশ্বাসযোগ্য কারণ বর্ণনা করে কাহিনীর চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। টড তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেছেন রতনসিংহ কেন মেবারের সিংহাসনের অধিকারী হবার পরেও অলকাকে আপন গৃহে আনেন নি। টডের বর্ণনা অনুযায়ী রতন ইতিপূর্বে সূরজের ভগ্নীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাই অলকার প্রতি পরবর্তীকালে তার উপেক্ষা প্রদর্শন, কিন্তু লেখিকা তাঁর কাব্যে এই ব্যাপারে কিছুই বলেন নি।

প্যারীশংকর দাশগুপ্ত প্রণীত 'মহারাণা প্রতাপ সিংহ' কাব্যটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। অষ্টম পরিচ্ছেদে কাব্যটি সমাপ্ত। মহারাজ মানসিংহের প্রতাপের নিকট আতিথ্য গ্রহণ থেকে প্রতাপের মৃত্যুবরণের বিবরণ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। কাব্যটির প্রারম্ভেই কবি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন :

কেন আজি দাসভূমে বীরত্ব বাখান,
বিজন কাননে কেন তুরীর নিনাদ,
যার রক্তে বীর হৃদি না হবে স্পন্দিত।
কোথা সেই রাজপুত বীরত্ব আধার,
সত্যবাদী বীরমূর্ত্তি মহত্ত্ব নিলয়,
কোথা হংসপুচ্ছ ধারী অধম বাঙ্গালী।

কাব্যটির ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষণীয়—

দূরহতে উচ্চস্বরে রাজপুত্র ডাকি তারে
করিলেন নমস্কার "নীলঘোড়া আশোয়ার"
বলে অশ্বারোহী তার আইলা নিকটে
খোরাসানী মুলতানী শত্রুর জীবন হানি
বিপক্ষের অনুরক্ত প্রতাপের ভ্রাতা শক্ত
আইলা নিকট তার এ গিরি সঙ্কট। (পৃঃ ২১)

কবি দুঃখ করে বলেছেন :

হায় এ ভারতে কেবা গুণের করয়ে সেবা
কেবা গায় বীরকীর্ত্তি কে জানে গাইতে
নতুবা বিদেশবাসী বীর মোরা ভালবাসি
ভারত-গৌরব বীরে নাহি শ্রদ্ধা চিতে।

কবি কাব্যটির উপাদান টডের 'রাজস্থান' থেকেই যে সংগ্রহ করেছিলেন, তা বেশ বোঝা যায়।

'নির্মাল্য' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে পারঙ্গম রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পরামর্শে টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে কাব্য রচনায় ব্রতী হন। এবং সুদীর্ঘ দশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে রাজেন্দ্রনারায়ণ 'রাজমঙ্গল' (১৯১২) শীর্ষক সুবৃহৎ কাব্যটির রচনা সমাপ্ত করেন। সুবিশাল 'রাজমঙ্গল' কাব্যটি পূর্বার্দ্ধ এবং পরার্দ্ধ—এই দু'টি বিভাগে বিভক্ত। কতিপয় বীরকাহিনী এবং অলৌকিক বীর চরিত্রকে পূর্বার্দ্ধে 'বীরব্রত' পর্যায়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সে সকল চরিত্রকে প্রকাশ করা হয়েছে এই পর্যায়ে, সেগুলি হ'ল যথাক্রমে বাপ্পারাও, হামীর, চণ্ডরাজ, পৃথ্বীরাজ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ এবং রাজসিংহ।

'রাজমঙ্গলে'র পরার্দ্ধ 'সতীক্ষেত্র' নামে নামাঙ্কিত। এই পর্যায়ে পদ্মিনী, ধাত্রীপান্না, সরোজিনী, কৃষ্ণকুমারী ও যোধাবাই—এই পাঁচটি চরিত্রকে বর্ণনা করা হয়েছে। 'রাজমঙ্গল' 'রাজস্থানে'র পদ্য অনুবাদ নয়, বিবৃতি মাত্র। কবিবর নবীনচন্দ্র কাব্যটি সম্পর্কে লিখেছিলেন :

'রাজস্থান অবলম্বন করিয়া আমি তোমাকে একখানা কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে এরূপ বিরাট ব্যাপার সংগঠন করিয়া তুলিবে, এ কল্পনা আদৌ আমার মনে জাগে নাই। যদি তুমি তোমার অনুষ্ঠান অনুসারে রাজমঙ্গল সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পার, তবে আমার গুরুগিরি

বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা অতিবড় শ্লাঘার বিষয় হইবে, আমি একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি।'

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কাব্যটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন: 'বাঙ্গালা-সাহিত্যে রাজনৈতিক কোন কাব্য নাই, ইহা নূতন উদ্যম, এযুগে রাজনৈতিক কাব্যের একান্ত প্রয়োজন।'

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতেও কাব্যটি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

'Rajmongal—Such is the title of a big poem in Bengali being a reproduction if we may so call it, of the scenes and episodes described by the Lieutenant colonel Todd in his famous "Rajasthan" in Verse. It is a bold conception and large undertaking and if successful will enrich the Bengali Literature to a very Considerable extent. Babu Rajendra Narayan Mukherjee Editor of the "Nirmalya" a very well Conducted and well got up Bengali Periodical, started and maintained under the kind patronage of Maharaja Bahadoor Surja kanto Acharjee, is the young poet who has under taken the herculean task of issuing a poetical edition of Todd's "Rajasthan". [২১]

বিপিনবিহারী নন্দী রচিত ও প্রকাশিত 'সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান' প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। প্রকাশকালের বিচারে 'রাজমঙ্গল' পূর্ববর্তীকালের রচনা। বাঙ্গালায় 'রাজস্থানে'র বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত এইটিই একমাত্র মহাকাব্য। রাজস্থান, মিবার, অম্বর, মারবার, বিকানীর, জয়সলমের, বুন্দি ও কোটা—এই সপ্তকাণ্ডে সমগ্র কাব্যটি বিভক্ত। লেখক রামায়ণ-মহাভারতের মতই 'রাজস্থান'কে গৌরবদান করেছেন। টড সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য:

'ভিন্ন ধর্মী, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী হইয়াও তিনি যেই প্রকার অলৌকিক অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য, এবং অদ্ভুত অনুসন্ধানের

যারা রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। যাঁহার হৃদয় মহৎ নহে তিনি কখনও পরের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। যদি মহাত্মা টড ভারতবর্ষে না আসিতেন, যদি হিন্দু বীরগণের চরিত্র মাহাত্ম্য দর্শনে তাঁহার প্রাণ উদ্বেলিত না হইত, তাহা হইলে আমরা রাজস্থানের নাম পর্যন্ত শুনিতাম কিনা তাহাও সন্দেহস্থল।'

লেখক তাঁর গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,'

'মহামতি টডের রাজস্থান আছে, তাহার গদ্যানুবাদ আছে, আবার পদ্য রাজস্থানের দরকার কি ?...অন্য ভাষায় যিনি যতই পারদর্শী হউন না কেন, মাতৃ ভাষার ডাক না শুনিলে কাহারও প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে না। আবার গদ্য হইতে পদ্যের শক্তি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহাও বোধহয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। বিশেষতঃ সেই জাতির অভিধান পর্যন্ত পদ্য তাহার নিকট পদ্য যে বিশেষ প্রীতিকর হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাকবি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস যদি সরল সুন্দর সুললিত ছন্দে বঙ্গ ভাষায় রামায়ণ মহাভারত না লিখিতেন, তাহা হইলে উক্ত মূল্যবান গ্রন্থদ্বয়ও বেদ উপনিষদের মত বাঙ্গালীর স্বপ্নের জিনিস হইয়া থাকিত।'

লেখক 'রাজস্থানে' বর্ণিত কোন চরিত্রকেই পরিবর্তিত করেন নি। কেবল 'রাজস্থানে' বর্ণিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব শৃঙ্খলাবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। কাব্যটি মহামতি টডের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত।

লেখক মূলতঃ ছিলেন কবি। 'অর্ঘ্য', 'চন্দ্রধর', 'নারী' ইত্যাদি কাব্যগুলির তিনি রচয়িতা। আলোচ্য কাব্যটিতেও লেখকের মুন্সীয়ানা বেশ পরিস্ফুট। সমগ্র কাব্যটি পয়ার ছন্দে রচিত, তবে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দেরও ব্যবহার আছে। গ্রন্থটির নামকরণ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

'মারবার বিকানীর মিবার অম্বর
কোটা বুন্দি যশল্মীর রাজ্য মনোহর
আছে যার বক্ষজুড়ে সেই রাজস্থান,
শৌর্য বীর্য ঐশ্বর্যের বিরাট শ্মশান।

সেই রাজ্য সপ্তকের পুণ্য ইতিহাস
সপ্তকাণ্ড রাজস্থান নামেতে প্রকাশ।'

কবি কাব্যটি আরম্ভের পূর্বে প্রথমেই সরস্বতীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। কবির বর্ণনা বেশ স্বচ্ছন্দ। কাব্যের মাঝে মাঝে উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্য বেশ প্রশংসনীয়। রচনার মাঝে মাঝে উজ্জ্বল ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভাষা ও ছন্দের ওপর কবির অনায়াস আধিপত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল দিকপাল কবি সাহিত্যিকই কিছু না কিছু রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম থাকেন নি। তাঁকে 'রাজস্থান' অবলম্বনে কবিতা রচনা করতে দেখা গেছে। অবশ্য তিনি অন্যান্যদের মত 'রাজস্থান'কে বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নি। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কথা' পর্যায়ে সর্বমোট চারটি কবিতা 'রাজস্থানে'র বিষয় অবলম্বনে রচিত। চারটি কবিতাই ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রচিত। কবিতা চারটি হ'ল যথাক্রমে 'রাজবিচার', 'নকলগড়', 'হোরিখেলা' এবং 'বিবাহ'। রাজপুতানা যে কবিচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করেছিল, তার প্রমাণ আমরা কবির রচিত 'রাজপুতানা' শীর্ষক কবিতাটির মধ্যেই পেয়ে থাকি। এই কবিতাটি অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের রচনা (১৩৪৫, ২২শে জ্যৈষ্ঠ)। এ'টি কবির 'নবজাতক' কাব্যে স্থান পেয়েছে।

পাদটীকা

১. আধুনিক বাংলা কাব্য ; ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৬৯
২. রাজস্থান কাহিনী ; ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো ; পৃঃ ২৩২
৩. ঐ ঐ পৃঃ ২৩৩
৪. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap VI ; Page 219

৫.	Ibid ;	Vol I ;	Chap VI ;	Page 219
৬.	Ibid ;	Vol I ;	Chap VI ;	Page 219
৭.	Ibid ;	Vol I ;	Chap VI ;	Page 219
৮.	Ibid ;	Vol I ;	Chap VI ;	Page 220-221
৯.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494
১০.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 495
১১.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494
১২.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494
১৩.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494
১৪.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494
১৫.	Ibid ,	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494
১৬.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494
১৭.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 494-495
১৮.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 495
১৯.	Ibid ;	Vol I ;	Chap XXIII ;	Page 495

২০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড ; ৩য় সংস্করণ) ;
ডঃ সুকুমার সেন ; পৃঃ ১১৫

২১. Bengalee ; 10th August, 1901

পঞ্চম অধ্যায়

টডের 'রাজস্থান' ও বাঙ্গালা উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক ও সামাজিক এই দুই শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু তুলনা মূলক বিচারে শেষোক্ত ক্ষেত্রেই যেন তাঁর প্রতিভার উৎকর্ষ আত্মপ্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র লাভ করে। স্বর্ণকুমারী দেবী রমেশচন্দ্রের আদর্শেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত হন। তবে রমেশচন্দ্র যেরূপ ইতিহাসের বহুলপরিচিত ঘটনাকে অবলম্বন করেছিলেন, স্বর্ণকুমারী সেক্ষেত্রে স্বল্প-পরিচিত কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন।[১] এই কারণে রমেশচন্দ্রের তুলনায় স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যের পরিমাণ অনেক কম। স্বর্ণকুমারী বিরচিত ত্রিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) উপন্যাসটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত। মহম্মদঘোরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের যুদ্ধের ঘটনাই উপন্যাসটির মুখ্য বর্ণিত বিষয়। লেখিকা গ্রন্থের উপক্রমণিকায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, গ্রন্থে চিতোরাধিপতি সমরসিংহের বয়ঃক্রম ইতিহাসাপেক্ষা চার বৎসর অধিক করেছেন। প্রসিদ্ধ রাজপুত কবি চাঁদকবিকে উপন্যাস মধ্যে 'কবিচন্দ্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। টড বলেছেন :

'Samarsi, Prince of Cheetore, had married the sister of prithwi Raj.'[২]

কিন্তু লেখিকা উপন্যাসে সমর সিংহ যে পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি ছিলেন, এই সম্পর্কের কোন উল্লেখ করেন নি। সমালোচক এই অনুল্লেখের কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "সম্ভবত আত্মীয়তার সূত্রে পৃথ্বীরাজকে সাহায্যদান একটি সাধারণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবার

সম্ভাবনা। দেশমাতৃকার সেবার জন্যেই যে সমরসিংহের যুদ্ধযাত্রা এইটি দেখানোই স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্য ছিল।"৩ উপন্যাসে বর্ণিত সমরসিংহের পত্তন—রাজকন্যার পাণিগ্রহণের বিষয়টির সমর্থন টডের বর্ণনায় অবশ্য মেলে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে যে পত্তন রাজকন্যার গর্ভজাত কুমারসিংহ নিরুদ্দিষ্ট হবার কারণেই সমরসিংহ চিতোরাধিপতি চতুর্ভুজা দেবীর কাছে তাঁর মাথার মুকুটটি পরিত্যাগ করেন। সমরসিংহ আরও শপথ করেন যে তিনি অতঃপর আর রাজকীয় বেশভূষায় ভূষিত হবেন না, মাথায় বহন করবেন জটাভার এবং সমরসিংহ এরপর থেকে 'যোগীন্দ্র' নামে পরিচিত হন। টডের বর্ণনাতেও সমরসিংহকে 'যোগীন্দ্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর রাজকীয় পরিচ্ছদ ত্যাগের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে :

'The style of address and the apparel of Samarsi betoken that he had not laid aside the office and ensings of 'Regent of Mahadeva.' A simple necklace of the seeds of the lotus adorned his neck, his hair was braided, and he is addressed as Jogindra, or Chief of ascetics.' [8]

উপন্যাসে সমরসিংহের চরিত্রটি মুখ্যত টডের বর্ণনানুসরণেই চিত্রিত হয়েছে।

কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্রের সঙ্গে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বিরোধের অন্যতম কারণরূপে উপন্যাসে বর্ণিত দিল্লীশ্বর কর্তৃক পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারটি টডও বর্ণনা করেছেন। এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন সে বিষয়ে সমর্থন মেলে টডের রচনায়—

'Jeychund of Kanouj and Prithwi Raj bore the same relative situation to Anungapal; Beejipal, the father of the former, as well as Someswar, having had a daughter of the Tuar to wife. This originated the rivalry between the

Chohans and Rahtores which ended in the destruction of both. When Prithwi Raj mounted the throne of Delhi, Jeychund not only refused to acknowledge his supremacy, but set forth his own claims to this distinction.' [৫]

সমরসিংহের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান করণসিংহ যে চিতোরাধিপতির উত্তরাধিকারী ছিলেন—এ তথ্য লেখিকা টডের বর্ণনা থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন—

'Samarsi had several sons, but Kurna was his heir' [৬]

করণসিংহের জননী সম্বন্ধে টড উল্লেখ করেছেন :

'his mother, Karmudevi, a Princess of Putun' [৭]

লেখিকা এই কার্মুদেবীকেই 'কমলাদেবী' বলে উপন্যাসে অভিহিত করেছেন। সমরসিংহের যুদ্ধ বিষয়ে যে বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য এবং অসাধারণ বক্তৃতার দ্বারা সৈন্যমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, টডও এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন :

'brave, cool, and skilful in the fight ; prudent, wise, and eloquent in council ; pious and decorous on all occasions ; beloved by his own chiefs, and reverenced by the vassals of the chohan. In the line of march no augur or bard could better explain the omens, none in the field better dress the squadrons for battle, none guide his steed or use his lance with more address. His tent is the principal resort of the leaders after the march or in the intervals of battle, who were delighted by his eloquence or instructed by his knowledge.' [৮]

এমন কি দিল্লীতে সমরসিংহের উপস্থিতি কিরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করত এবং পৃথ্বীরাজ ও তাঁর সভাসদ্‌গণ কর্তৃক সমরসিংহের বর্ণনাও টডের বর্ণনানুগত :

'His arrival at Delhi is hailed with songs of joy as a day

of deliverance. Prithwi Raj and his court advance seven miles to meet him.'[৯]

যুদ্ধে কল্যাণসিংহ ও তাঁর পিতা সমরসিংহের মৃত্যুর ঘটনাও টডের অনুসরণেই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দিল্লীর কুলদেবী বলে অভিহিত যে আশাপূর্ণাদেবীর উল্লেখ আছে, তা টডের অনুসরণেই করা হয়েছে। 'দীপনির্বাণের' কাহিনী মুখ্যতঃ টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনেই রচিত। আবার টড নিজে যেহেতু পৃথ্বীরাজ-সমরসিংহ-মহম্মদ ঘোরীর কাহিনী বর্ণনায় মুখ্যতঃ চাঁদকবির কাব্য অনুসরণ করেছেন, আমাদের লেখিকা তদ্রূপ বহু উপাদান চাঁদ কবির কাব্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। স্বর্ণকুমারীদেবীর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসটি লেখিকার নিতান্ত অপরিণত বয়সের রচনা। তাই এই উপন্যাসটিতে বহুবিধ ত্রুটি লক্ষিত হয়ে থাকে। রচনারীতি, চরিত্র-চিত্রণ এবং শিল্পকৌশল কোন ক্ষেত্রেই লেখিকা বাঞ্ছিত সাফল্যলাভে সমর্থ হন নি। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনীর সামঞ্জস্য বিধানে লেখিকার ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য। দিলীপ-শৈলবালা এবং কল্যাণসিংহ-ঊষাবতী-বিজয়সিংহ-গোলাপের বৈচিত্র্যহীন প্রণয়কাহিনী অনাবশ্যকভাবে উপন্যাসের ভার বৃদ্ধি করেছে।

'কিরণের ব্যাঘ্র-শিকার, তেজসিংহের আকস্মিক আবির্ভাব এবং পলায়ন, কিরণ-শৈলবালা প্রভাবতীর মিলন, বিজয় সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সমস্তই আকস্মিক এবং আরোপিত। এই আকস্মিকতার পশ্চাতে বাস্তবতার ন্যূনতম দাবীও অস্বীকৃত হয়েছে।'[১০]

অন্য এক সমালোচক অবশ্য এইসব প্রণয়কাহিনী সংযোজনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেছেন।—

'টডের রাজস্থানে কিংবা চন্দবরদাইয়ের পৃথ্বীরাজ রাসোর মধ্যে এ সকল কাহিনী অনুপস্থিত—তথাপি স্বর্ণকুমারীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা এর মধ্যে প্রতিফলিত এবং অপূর্ব বস্তু নির্মাণ কৌশলে তিনি এই উপাখ্যান-

গুলিকে মূল উপন্যাসের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। আর একটি দিক থেকে ইতিহাসে অনুচ্চারিত এইসব ঘটনার প্রয়োজনীয়তা উপন্যাসের মধ্যে স্বীকার করা যায়। পৃথ্বীরাজ রাসো ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাস নির্ভর মহাকাব্য, তন্মধ্যে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার প্রণয়—একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, কিন্তু দীপনির্বাণের মধ্যে সে কাহিনীর অনুপস্থিতি হয়ত স্রষ্টার মানসলোকে একটা অপূর্ণতা ও অভাববোধ সৃষ্টি করেছিল, তাই পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার প্রণয়কথার বিকল্প তিনি অন্যবিধ প্রেমকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।' ১১

'রাজস্থানে'র বিষয় অবলম্বনে পরবর্তীকালে রচিত লেখিকার দুটি উপন্যাসের তুলনায় আলোচ্য উপন্যাসটিকে নিতান্তই অক্ষম রচনা বললে অত্যুক্তি হয় না।

স্বর্ণকুমারীর 'মিবাররাজ' (১৮৮৭) এবং 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাসদ্বয়ও রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বলাবাহুল্য লেখিকা এই গ্রন্থদ্বয়েও টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত ঘটনাকে অবলম্বন করেছিলেন।

'মিবাররাজ' ষোড়শ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত স্বল্পায়তনবিশিষ্ট উপন্যাস। ভীল ও রাজপুতের জাতিগত বিরোধকেই গ্রন্থমধ্যে রূপায়িত করা হয়েছে। যে ঘটনাকে গ্রন্থে রূপায়িত করা হয়েছে সেটি ছোট গল্প রচনার পক্ষেই অধিকতর উপযুক্ত। বস্তুতঃ গ্রন্থটিতে বর্ণিত স্বল্পাবয়ব ঘটনাবিন্যাস ঠিক উপন্যাসোচিত হতে পারে নি। কোন চরিত্রই তেমন বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। গ্রন্থমধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভীলরাজপুত্রের অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রকাশ এবং সত্যবতীর সঙ্গে গুহাদিত্যের স্নেহের সম্পর্কের চিত্রটি।

উপন্যাসে 'গুহার' জন্মবিবরণ ও বাল্যকাল বিষয়ে লেখিকা টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন।—

'She (Pushpavati) was a daughter of the Pramara Prince of Chandravati, and had visited the shrine of the universal mother, Amba Bhavani, in her native land, to deposit upon

the altar of the goddess a votive offering consequent to her expectation of offspring. She was on her return, when the intelligence arrived which blasted all her future hopes, by depriving her of herlord, and robbing him, whom the goddess had just granted to her prayers, of a crown. Excessive grief closed her pilgrimage. Taking refuge in a cave in the mountains of Mallia, shewas delivered of a son···camalavati, the daughter of the priest of the temple, was herself a mother, and she performed the tender offices of one to the orphan Prince, whom she designated Goha, or 'cave-born.' ১২

উপন্যাস লেখিকা কমলাবতীকে মৃত পুরোহিতের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করলেও টডের বর্ণনায় তাঁকে পুরোহিতের কন্যারূপে অভিহিত করা হয়েছে। তবে লেখিকা 'কমলাবতী' নামটি ঠিকই রেখেছেন। কিন্তু কমলাবতীর কন্যারূপে 'সত্যবতী' চরিত্রটি লেখিকার স্বকপোলকল্পিত। এবং বলাবাহুল্য সত্যবতী ও গুহাকে অবলম্বন করে ভাই-বোনের যে মধুর চিত্রটি উপন্যাসে চিত্রিত করা হয়েছে, সেটিও লেখিকার স্বাধীন সংযোজন।

উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে গুহার নামানুসারেই মিবারের রাজগণকে পরবর্তীকালে 'গুহ্লট' আখ্যায় ভূষিত হতে দেখা গেছে। এই বিষয়ে টড বলেছেন :

'Goha's name became the patronymic of his descendants, who were styled Gohilote, classically Grahilote, in time softened to Gehlote.' ১৩

বাল্যকালে গোহের অস্থিরতা, লেখাপড়ার পরিবর্তে পশুপক্ষী শিকার, ভীল বালকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি বিবরণের সমর্থন টডের বর্ণনাতেও মেলে—

'The child was a source of perpetual uneasiness to its protectors; he associated with Rajpoot children, killing birds, hunting wild animals, and at the age of eleven was

totally unmanageable : to use the words of the legend., 'how should they hide the ray of the sun." [১৪]

'At this period Edur was governed by a chief of the savage race of Bhil; his name, Mandalica. The young Goha frequented the forests in company with the Bhils, whose habits better assimilated with his daring nature than those of the Brahmins. He became a favourite with the vana-pootras, or "children of the forest." [১৫]

ক্রীড়াচ্ছলে ভীল বালকগণ কর্তৃক গোহকে রাজা নির্বাচন এবং ভীলরাজ মাণ্ডলিক কর্তৃক তার স্বীকৃতিদানের বিষয়েও রাজস্থানের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়েছে—

'The Bhils having determined in sport to elect a king' the choice fell on Goba ; and one of the young savages, cutting his finger, applied the blood as the teeka of sovereignty to his forehead. What was done in sport was confirmed by the old forest chief.' [১৬]

উপন্যাসের প্রথমেই বর্ণিত শিকার দৃশ্য এবং বৃক্ষ-ছেদনের মাধ্যমে রাজপদ গ্রহণের ব্যাপারে ভীল রাজকুমার ও গোহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ লেখিকার স্বকৃত সংযোজন।

উপন্যাসে গোহকেই ভীলরাজ মাণ্ডলিকের হত্যাকারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। টডও বলেছেন—

'The sequel fixes on Goba the stain of ingratitude, for he slew his benefactor, and no motive is assigned in the legend for the deed,' [১৭]

অথচ টড আবুল ফজলের উক্তি উদ্ধৃত করে পুনরায় বাপ্পাকেই মাণ্ডলিকের হত্যাকারীরূপে স্বীকার করেছেন—

বলাবাহুল্য যে গোহ এবং বাপ্পা এক ব্যক্তি নন। অতএব টড এক্ষেত্রে আবুল ফজলের বক্তব্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বলা চলে।

পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গোহ' শীর্ষক গল্পটিতে লেখক অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে মাণ্ডলিকের পাহাড় থেকে পতন এবং গোহের নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি ছুরিকায় বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে,

'দীপনির্বাণ রাজপুত জাতিব নির্বাণের কাহিনী, 'মিবারবাজ' রাজপুত জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস'।[১৮]

স্বর্ণকুমারী দেবীব ষডচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাসটির সূত্র 'রাজস্থান' থেকে গৃহীত হলেও লেখিকা এই উপন্যা'স এমন এক কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন, 'রাজস্থানে' যে বিষয়ে নিতান্ত সীমিত পরিসরে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে উপন্যাসের গল্পাংশ রচনাব জন্যই যে লেখিকা ইচ্ছাপূর্বক এই কাহিনীটি অবলম্বন করেছিলেন, স্পষ্টতঃই তা প্রতিভাত হয়। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটির নায়ক রানা বাপ্পাদিত্যেব পিতা গিহেলাট রাজবংশের অষ্টম রাজকুমার নাগাদিত্য। টড নাগাদিত্য সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র উল্লেখ করেছেন যে, ভীলেরা রাজপুত শাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নাগাদিত্যকে হত্যা করে এবং এইরূপে দীঘদিনের বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্তিলাভ করে। টডেব ভাষায়ঃ

'We know very little concerning these early Princes, but that they dwelt in this mountainous region for eight generations , when the Bhils, tired of a foreign rule, assailed Nagadit, eighth Prince, while hunting, and deprived him of life and Edur.'[১৯]

আলোচ্য উপন্যাসটিতে তথ্যানুস্মৃতির ব্যাপারে লেখিকা দীর্ঘদিনের রাজপুত শাসনে বীতশ্রদ্ধ ভীল কর্তৃক না।াদিত্যের হত্যা কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন আর বর্ণনা করা হয়েছে অকৃতজ্ঞ গুহা কর্তৃক ভীলরাজ মাণ্ডলিকের হত্যার বিষয়। এতদ্ব্যতীত আর সকল চরিত্র ও ঘটনাই লেখিকার নিজস্ব সংযোজন।[২০] তবে ঐতিহাসিক তথ্যানুসরণের

সুযোগ কম হলেও সমগ্র উপন্যাসটিতে রাজপুত শাসনে বীতশ্রদ্ধ পরাধীন ভীলজাতির ক্ষোভের চিত্রটিকে লেখিকা অত্যন্ত নৈপুণ্য-সহকারে উপস্থাপিত করেছেন। ভীলদের সঙ্গে রাজপুতের জাতিগত বিরোধের মধ্যে যেন ইংরাজের সঙ্গে ভারতীয়দের বিরোধের ক্ষীণ আভাসটুকু লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচক আরও একটু অগ্রসর হয়ে মন্তব্য করেছেন,

'স্বর্ণকুমারী সমসাময়িক কালের বেদনার প্রতিচ্ছবি ভীলদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন বর্ণনায় প্রক্ষেপ করেছেন।' [২১]

'রাজস্থানে' নাগাদিত্যের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু উল্লিখিত না হলেও লেখিকা তাঁর উপন্যাসে এ বিষয়ে কাল্পনিক বিবরণ দান করেছেন। তবে নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে ভীলদের উত্তেজিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে অগ্রণী জঙ্গুকে ভীলরাজ মাণ্ডলিকের বংশধররূপে চিত্রিত করে তাঁর পূর্বপুরুষ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে ভীলদের রাজসিংহাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভকে যুক্ত করে লেখিকা বাস্তবিকই মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। জঙ্গুর রাজপুতদের বিরুদ্ধে জুমিয়াকে উত্তেজিত করার মধ্যেও যেন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে পরাধীন বঞ্চিত ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ধ্বনিত হতে দেখা গেছে।

জঙ্গুর পুত্র জুমিয়ার সঙ্গে নাগাদিত্যের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, জুমিয়ার পালিতা কন্যা সুহারের প্রতি রাজার আকর্ষণ এবং এই কারণে রাণী ও রাজার মনোমালিন্য, শেষপর্যন্ত সুহারকে ব্রাহ্মণ কন্যারূপে অবগত হয়েও রাজা তার পাণিপ্রার্থী হলে জুমিয়ার বর্শার আঘাতে রাজা ও রাণীর মৃত্যুবরণের ঘটনা সকলই লেখিকার স্বকপোলকল্পিত। টডের বর্ণনায় শিকার করা কালীন সময়ে নাগাদিত্যের মৃত্যুর বিষয় বর্ণিত হলেও আলোচ্য উপন্যাসে ব্রাহ্মণ কন্যা সুহারকে বিবাহ করা উপলক্ষে নাগাদিত্যের মৃত্যুবরণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

ঝল্লুর গণনার প্রসঙ্গ উপন্যাসে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

সুহারকে কেন্দ্র করে রাজা ও রাণীর মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্যের চিত্রটি বাস্তবিক অনবদ্য। বিশেষতঃ প্রতিহিংসাপরায়ণ জঙ্গুর প্ররোচনায় নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে প্রীতি ও মৈত্রীর কারণে প্রকাশিত জুমিয়ার চিত্তের দ্বন্দ্বের চিত্রটিও অনবদ্য। সর্বোপরি উল্লেখ করতে হয় উপন্যাসটির অনুপম ভাষাশৈলীর কথা। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ভীলদের চরিত্রের উপযোগী ভাষা সৃষ্টিতে লেখিকার নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলতে হয়:

'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত সর্বদা তুলনীয়, এমন কি কোন বিষয়ে—ভাষা, কবিত্বশক্তি বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের দিক্ দিয়া—রমেশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবি করিতে পারে।'[২২]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাজসিংহ (১৮৭৭)-কেই একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু বঙ্কিম পেয়েছিলেন মূলতঃ টড প্রণীত 'রাজস্থান' গ্রন্থটি থেকে। বঙ্কিম স্বয়ং তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের সূত্র সম্বন্ধে 'রাজসিংহে'র চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসেও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঔরঙ্গজেব প্রবর্তিত জিজিয়াকর সম্বন্ধে রাজসিংহ কর্তৃক ঔরঙ্গজেবকে প্রেরিত পত্র প্রসঙ্গে টডের অভিমতের কিয়দংশ উদ্ধার করেছেন লক্ষ্য করা যায়।[২৩]

রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে, টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করেই উপন্যাসের কাহিনীটি পরিকল্পিত। উপন্যাসটির উপাদান সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেছেন:

"স্থূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমন রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনা প্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ যাহা ইতিহাসে নাই তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা, উদিপুরী—ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্র ইতিহাসে

যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে; সকলই ঐতিহাসিক নহে। বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনা প্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

সমালোচকের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনাতেও বঙ্কিমের বক্তব্যের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়:

'ঔপন্যাসিক ইতিহাসের প্রয়োগ করেন উহার নির্ভুল তথ্যানুস্মৃতির দিক দিয়া নহে, উহার সাধারণ জীবন সত্য ও যুগের সাধারণ লক্ষণের দিক দিয়া। অবশ্য ঔপন্যাসিকের ইতিহাস-চিত্রে একটা জীবনানুগ অন্তঃসঙ্গতি থাকা চাই ও কোনও কালানৌচিত্য দোষ যেন ইহাতে অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া না উঠে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তন করার অধিকার তাঁহার নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের ফলাফল ঠিক রাখিতে হইবে—কিন্তু গৌণ চরিত্রকে তিনি ইচ্ছামত অঙ্কিত, ও যুদ্ধের মধ্যে কিছু কিছু নূতন ঘটনা তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী সংযোজন করিতে পারেন।'[২৩]

এইবার 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির উপাদান সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেব ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

কিন্তু জেবউন্নিসা—মবারক-দরিয়া এবং মানিকলাল-নির্মলকুমারীর প্রেমকাহিনী লেখকের স্বকপোলকল্পিত। জেব উন্নিসা চরিত্রটি অবশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। রূপনগরের রাজকুমারীকে লেখক 'চঞ্চলকুমারী' বলে অভিহিত করেছেন এই নামটি কিন্তু লেখক প্রদত্ত। চঞ্চলকুমারীর প্রকৃত নাম 'চারুমতী'। বঙ্কিম ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী রূপে যোধপুরী বেগমকে (যোধপুর রাজকন্যা) অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল ঔরঙ্গজেব কোন যোধপুর রাজকন্যার সঙ্গেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হননি। তাঁর একমাত্র হিন্দু পত্নী ছিলেন 'নবাব-বাঈ'। বঙ্কিম জেবউন্নিসাকে ইন্দ্রিয় বিলাসিনী রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এও অনৈতিহাসিক।

উপন্যাসের ৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে চঞ্চল কুমারীর উক্তিতে বলান হয়েছে—

'তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব ? হংসী কী বকের সেবা করে…দিল্লীর পথে বিষ খাইব ?'

এর সূত্রটুকুর সন্ধান পাওয়া যায় টডের বর্ণনায় :

'The family priest (her preceptor) deemed his office honoured by being the messenger of her wishes, and the billet he Conveyed is incorporated in the memorial of this reign. "Is the swan to be the mate of the stork: a Rajpootni, pure in blood, to be wife to the monkey "faced barbarian !" Concluding with a threat of self destruction if not saved from dishonour.' ২৪

উপন্যাসের ৭ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে এবং ৮ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে রাজপুত সৈন্য কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের অন্তরীণ হওয়া এবং অনাহারের সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত উদিপুরী বেগম বন্দিনী হবার পর তাঁর মুক্তিলাভের বিবরণও যথার্থ নয়। অবশ্য অর্মের (orme) বিবরণে এরূপ ঘটনাই উল্লিখিত হয়েছে।

বঙ্কিম 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।'—এই কারণেই বঙ্কিম রন্ধ্র মধ্যে ঔরঙ্গজেবের শোচনীয় দুর্গতির চিত্র উপন্যাস মধ্যে টডের পরিবর্তে অর্মের (orme) অনুসরণে উপস্থাপিত করেছেন। রাজসিংহের বাহুবল তথা রণনৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ছিল এক্ষেত্রে লেখকের প্রকৃত অভিপ্রায়। কিন্তু টডের বর্ণনায় লক্ষিত হয় শাহজাদা আকবর রাজপুত সৈন্যদ্বারা বিশেষ ভাবে অন্তরীণ তথা শোচনীয় দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছেন :

'Prince Akber advanced, "Not a soul interrupted his progress to the city. Palaces, gardens, lakes and isles, met his eye, but no living thing: all was silence." Akber

encamped……The allodial vassals of the mountains, with the Bhil auxiliaries, outstripped his retreat, and blocked up farther egress in one of those long extended valleys termed Nal, closed by a natural rampart or col, on which they formed abbaits of trees, and manning the crests on each side, hurled destruction on the foe; while the Prince, in like manner, blocked up the entrance and barred retrogression. Death menaced them in every form. For several days they had only the prospect of surrender to save them from famine and a justly inceased foe, when an ill-judged humanity on the part of Jey Sing saved them from annihilation.'[২৫]

ঔরঙ্গজেব কর্তৃক রূপনগরের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় এবং দ্বিসহস্র মুঘল সৈন্যকে এই উদ্দেশ্যে রূপনগরে প্রেরণের বিষয়টি টডের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে মুঘলের পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক রূপনগরের রাজকুমারীর কুল পুরোহিতের মাধ্যমে রাজসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণের বিষয় এবং তদনুযায়ী মহারাণা কর্তৃক স্বল্প সংখ্যক রাজপুত সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজকন্যার উদ্ধার সাধনের চমকপ্রদ বিবরণ—

'The Mogul demanded the hand of the Princess of Roopnagurh, a junior branch of the Marwar house, and sent with the demand a cortage of two thousand horse to escort the fair to court. But the haughty Rajpootni, either indignant at such preciptation or charmed with the gallantry of the Rana, who had evinced his devotion to the fair by measuring his sword with the head of her house, rejected with disdain the proffered alliance, and, justified by brilliant precedents in the romantic history of her nation she entrusted her cause to the arm of the chief of the

Rajpoot race, offering herself as the reward of protection. The family priest deemed his office honoured by being the messenger of her wishes, and the billet he conveyed is incorporated in the memorial of this reign.'

...With a chosen band he (রাজসিংহ) rapidly passed the foot of the Arävali and appeared before Roopnagurh, cut up the imperial guards, and bore off the prize to his Capital.'[২৬]

ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মহারাণা রাজসিংহ কর্তৃক রাজপুত সৈন্য-সংস্থাপনের বিবরণ লেখক টডের বর্ণনানুসরণেই প্রদান করেছেন। বঙ্কিম রাজসিংহকে সপ্তদশ শতাব্দীর সের (Xe·xes)-রূপে অভিহিত করেছেন। এই উপমা দানের ক্ষেত্রেও তিনি টডের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন লক্ষিত হয়। কারণ টডও রাজসিংহকে 'X·rxes of Hındusthan' বলে অভিহিত করেছেন। ৭ম খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে লেখক ঔরঙ্গজেবের সৈন্যোদ্যোগের যে বিবরণ প্রদান করেছেন, তাও টডের বর্ণনানুগত। শাহ আলম, আজমশাহ, আকবরশাহ প্রভৃতি পুত্রগণের সেনানায়কত্বে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধযাত্রার বিবরণদান প্রসঙ্গে টড বলেছেন :

'Akber was recalled from his province, Bengal ; Azim from the distant Cabul; and even Mauzum (the Mogul's heir) from the war in the Dekhan. With this formidable array the emperor entered Mewar.'[২৭]

ঔরঙ্গজেব কর্তৃক দোবারি, দয়েলবারা এবং নয়ন—এই তিনটি গিরি পথের মধ্যে প্রথমটিতে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং 'উদয় সাগর' নামে বিখ্যাত সরোবর তীরে শিবির সংস্থাপন পূর্বক শাহজাদা আকবরকে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যসহ মেবারে প্রেরণের বিবরণও টডের গ্রন্থে বর্তমান :

'Arungzeb advanced to Dobarri', but instead of entering the valley of which it was the gorge, he halted, and by the

advice of Tyber khan sent on Prince Akber with fifty thousand men to the capital.'[২৮]

'Towards the plains east, it has three practicable passes; one, the more norther, by Dailwarra; the other (central) by Dobarri, a third, leding to the intricacies of chuppun that of Naen. of these three passes the emperor chose the most practicable, and encamped near the oody-Sagar lake, on the left of its entrance.'[২৯]

বিক্রম শোলাঙ্কি এবং গোপীনাথ রাঠোর কর্তৃক মুঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর পরাজিত হওয়ার যে বিবরণ ৮ম খণ্ডের ১৫শ পরিচ্ছেদে, প্রদত্ত হয়েছে তার সমর্থনও টডের বর্ণনাতে মেলে—

'Another body of the imperialists under the celebrated Delhire khan, who entered by the Daisoori Pass from Marwar (probably with a view of extricating Prince Akber), were allowed to advance unopposed, and when in the long intricate gorge were assailed by Bikram Salanki and Gopinath Rahtore (both nobles of Mewar), and after a desperate Conflict entirely destroyed.'[৩০]

৮ম খণ্ডের ১৬শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঔরঙ্গজেব ও আজিমের চিতোরে আশ্রয় গ্রহণ, রাজপুত সেনাপতি সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য খাঁ রহিলার অধীনে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য রেখে ঔরঙ্গজেবের আজমীরে পলায়ন, কুমার ভীমসিংহের মুঘলের অধিকারভুক্ত গুজরাটে প্রবেশ, রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ কর্তৃক কাজিদের মস্তক মুণ্ডন এবং কূপ মধ্যে কোরান নিক্ষেপের বিবরণাদি সমূহ টডের গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত।

পরিশেষে উপন্যাসটি রচনার সূত্রপাতে বঙ্কিমের যে দাবীর কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। কেউ কেউ 'রাজসিংহ'কে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক —বঙ্কিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি উপন্যাসখানিতে মানব জীবনের

মহিমাকেই সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে নীরস ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল লক্ষ্য নয়। ইতিহাসের আধারে মানব জীবনলীলাকে অঙ্কিত করাই ঔপন্যাসিকের মূল্য লক্ষ্য। বঙ্কিম 'রাজসিংহে' যে এই লক্ষ্যে সাফল্যের সঙ্গে উপনীত হয়েছেন, তা অনস্বীকার্য।

বঙ্কিম এবং ভূদেবের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেও বাল্যাবধি ইতিহাসের প্রতি যে তাঁর অন্তরের এক গভীর আকর্ষণ ছিল, সে কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। ভূদেব এবং বঙ্কিমকে বাদ দিলে অপরাপর প্রায় সকল লেখকই নিছক বৈচিত্র্য সৃষ্টি তথা বাস্তবের রূঢ়তা থেকে মুক্তিলাভের অভিপ্রায়েই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হয়েছিলেন ব্রতী। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ বশতঃই রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হয়েছিলেন মনোযোগী। ইতিহাস প্রিয়তাকেই রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মুখ্য কারণ রূপে অভিহিত করা চলে। রমেশচন্দ্র নিজেও স্বীকার করেছেন :

'I do not know if wir salter Scott give me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history.' [৩১]

রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। মূলতঃ হেমলতা এবং নরেন্দ্রের প্রেমোপাখ্যান হলেও লেখক এই উপন্যাসে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাকেও স্থান দিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপাদান লেখক প্রধানতঃ স্টুয়ার্টের **'History of Bengal'** থেকে গ্রহণ করলেও টডের 'রাজস্থান'কেও একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। মেবার ও মাড়োয়ারের দ্বন্দ্ব, নরেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করে চলে এলে দিল্লীতে রাজপুতদের মধ্যে সংঘটিত বিরোধ বিশেষত : যশোবন্ত সিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ, যশোবন্তের

সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ ইত্যাদির বর্ণনায় লেখক টডের গ্রন্থকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯)। দুটি উপন্যাসের উপাদানই লেখক সংগ্রহ করেছিলেন টডের 'রাজস্থান' থেকে। অকুণ্ঠ দেশপ্রেমিকতাই রমেশ-চন্দ্রকে মারাঠা ও রাজপুত ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে করেছিল আকৃষ্ট। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী এক অনুষ্ঠানে রমেশচন্দ্র প্রদত্ত ভাষণে পূর্বোল্লিখিত উপন্যাসদ্বয় রচনার সূত্র বিষয়ে বিশেষভাবে জানা যায়:

"...when I read grant Duff's inspiring work on the history of the Marhattas, and spent my nights in dreaming over a story of sivaji. I remember the days when I travelled over Trippera and occasionally crossed over to Hill Trippera, witn Tod's spirited History of Rajasthan in my knapsack, and when I ventured to compose a story of Pratap Sinha."

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে' চিত্রিত 'জয়সিংহে'র চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা লেখক পেয়েছিলেন টডের 'রাজস্থান' থেকেই। তার উদার্য, তিতিক্ষা ইত্যাদির ন্যায় বিরল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ 'রাজস্থানে' আমরা পাই।

'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' যে লেখক বিশেষভাবে টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনেই রচনা করেছিলেন, উপন্যাসটির শেষ পরিচ্ছেদে (পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ) প্রতাপের মৃত্যুর বিষয় বর্ণিত হবার পর লেখক স্বয়ং তা পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায়' লেখক মুখ্যতঃ মর্যাদাদীপ্ত একটি জাতির পতনের বর্ণনাকেই উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের এক গুরুত্ব পূর্ণ অংশ রাজপুত জাতির গৌরব রানা প্রতাপের স্বাধীনতা রক্ষার

প্রয়াস, তাঁর অপরিসীম দুঃখ বরণ, মানসিংহ রানা প্রতাপের রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রভৃতির বর্ণনাতে ব্যয়িত হলেও উপন্যাসটির মূল পটভূমি কিন্তু চন্দাওয়াৎ এবং রাঠোর কুলের বহুকাল প্রচলিত বিরোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাস মধ্যে একমাত্র তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রেমের চিত্র কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসটিকে এককথায় ইতিহাস-বর্ণিত কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা সমষ্টি রূপে অভিহিত করলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিম তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে (রাজসিংহে) যেরূপ ইতিহাসকে জীবনের সঙ্গে একত্রে গ্রথিত করেছেন, রমেশচন্দ্র সেক্ষেত্রে যে চরম ব্যর্থ হয়েছিলেন তারই নিদর্শন রূপে আলোচ্য উপন্যাসটির উল্লেখ করা যেতে পারে। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু কল্পনাদৈন্য সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুতর অন্তরায় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস যে সর্বোপরি উপন্যাস, লেখক এই সত্যটি হয়েছিলেন বিস্মৃত। হলদিঘাটের যুদ্ধ, রানা প্রতাপের কৃচ্ছ্রসাধন, শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা, মন্ত্রী ভামশা কর্তৃক প্রতাপকে অর্থ সাহায্যদান প্রভৃতি সকল ঘটনার বর্ণনাতেই লেখককে টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করতে দেখা গেছে। এমন কি প্রতাপের বীরত্ব উপলক্ষ্যে রচিত আকবরের সভাসদ্ খান খানানের কবিতাটিও লেখক টডের অনুসরণে রচনা করেছেন লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে বর্ণিত বিকানীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ কর্তৃক প্রতাপকে প্রেরিত কবিতাগর্ভ পত্রটিও টডের অনুসরণে রচিত।

একটি ক্ষেত্রে কেবল লেখক টডের বর্ণনা থেকে সরে এসেছেন তা হ'ল টডের বর্ণনানুযায়ী যেক্ষেত্রে ঘাসের বীজে প্রস্তুত রুটি বন্য বিড়াল কর্তৃক অপহৃত হলে প্রতাপ-কন্যা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং এর পরেই প্রতাপ আকবরের সঙ্গে সন্ধি করতে মনস্থ করেন, রমেশচন্দ্র কিন্তু সেক্ষেত্রে আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন দেবীসিংহের পুত্রের

মৃত্যুতে প্রতাপ নিজের ব্যর্থতা অনুভব করে আকবরের কাছে সন্ধি ভিক্ষা করেছিলেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায় মহারাণা প্রতাপসিংহের অলৌকিক জীবন অবলম্বনে 'প্রতাপ সিংহ' উপন্যাসটি রচনা করেন (১৮৮৪)। উপন্যাসটি প্রথমে 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক উপাদান লেখক টডের 'রাজস্থান' থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। লেখকের ভাষায়, 'ভারত-হিতৈষী মহাত্মা টড প্রণীত রাজস্থান নামক অপূর্ব গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন '

উপন্যাসটি দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি একবিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত; দ্বিতীয় খণ্ডটি সমাপ্ত দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। বঙ্কিমের অনুসরণে প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ লক্ষণীয়।

লেখক উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন, অন্যদিকে তাঁর স্বাধীন কল্পনাশক্তিরও স্বাক্ষর রেখেছেন। কোন কোন স্থানে আবার টডের বর্ণনার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ লক্ষিত হয়ে থাকে। মহারাণা উদয়সিংহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে, তা টডেরই বর্ণনানুগত। চিতোর উদ্ধারকল্পে প্রতাপের কঠিন কৃচ্ছ্র সাধন, সোলাপুর যুদ্ধ জয়ের পর প্রত্যাবর্তনকালে মহারাজ মানসিংহের স্বেচ্ছায় মহারানা প্রতাপের আতিথ্যগ্রহণ এবং মানসিংহের সঙ্গে একত্রে আহারে অসম্মত হওয়ায় প্রতাপের সঙ্গে তাঁর বিরোধ; হলদিঘাটের যুদ্ধের বিবরণ, যুদ্ধে প্রতাপের অসীম বীরত্ব প্রদর্শন, ঝালাপতি মান্নার আত্মোৎসর্গ, চৈতকের মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ টডের বর্ণনানুসরণেই রচিত। সম্রাট আকবরের পৃথ্বীরাজ পত্নীর রূপে আকৃষ্ট হওয়া এবং তাঁর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হবার চক্রান্ত, কিন্তু পৃথ্বীরাজ পত্নীর নির্ভীকতায় সেই চক্রান্তের ব্যর্থতা; কন্যার মুখের গ্রাস বন্যপ্রাণী কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় তার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন এবং সেই ক্রন্দনে প্রতাপের মানসিক দৃঢ়তার পারবর্তন সাধন—সম্রাট আকবরের নিকট

তাঁর সন্ধি প্রার্থনা; বিকানীর রাজ পৃথ্বীরাজ কর্তৃক কবিতায় রচিত পত্রে ভগ্নমনোবল প্রতাপকে উৎসাহদান—প্রভৃতিও টডের বর্ণনানুসরণেই রচিত। প্রতাপের মন্ত্রী কর্তৃক মেবার ত্যাগেচ্ছু হীনবল প্রতাপকে প্রভূত অর্থদানের বিষয়ও টড তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

উপন্যাসে কুমার অমর সিংহ ও রাজা রঘুবর রায়ের কন্যা উর্মিলা, কুমার রতন সিংহ ও দেবলবর রাজের কন্যা যমুনার যে রোমাণ্টিক আখ্যান সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেগুলি লেখকের স্বাধীন সংযোজন। হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে উর্মিলার উপস্থিতি এবং যুদ্ধে আহত অমরসিংহ ও রতনসিংহকে হলদিঘাটের অনতিদূরে অর্বলী পর্বতের নিভৃত দেশে অবস্থিত তাপসাশ্রমে আনয়ন, সেখানে উপযুক্ত শুশ্রূষার পর উভয় কুমারের আরোগ্যলাভ; ছদ্মবেশে রতনের প্রেমিকা যমুনা ও তার সহচরী কুসুমের তাপসাশ্রমে অবস্থান, মুঘল সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত অমরসিংহের ছদ্মবেশী উর্মিলা কর্তৃক জীবনরক্ষা—সকলই লেখকেই স্বাধীন কল্পনার পরিচয়বাহী।

লেখক উপন্যাসের কোন কোন ক্ষেত্রে যে টডের বর্ণনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করেছেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। টডের বর্ণনায় প্রতাপের মন্ত্রীকে 'ভামসা' (**Bhamsah**) বলে অভিহিত করা হলেও আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে লেখক তাঁকে 'ভবানী' বলে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসে মন্ত্রী প্রদত্ত অর্থ বিংশতি সহস্র মানুষের দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী ভরণ পোষণের উপযোগী বলে বলা হয়েছে। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায় এই অর্থ পঞ্চবিংশতি সহস্র মানুষের দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী প্রতিপালনের উপযোগী।

প্রতাপের কন্যার নাম টডের গ্রন্থে অনুল্লিখিত থাকলেও লেখক তাকে 'হেমন্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসে ঘাসের বীজে প্রস্তুত রুটি ইঁদুর কর্তৃক অপহৃত হবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু টডের বর্ণনায় বন্য বিড়াল কর্তৃক অপহৃত হবার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনকারী প্রতাপের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা শক্তসিংহের মিলিত হবার কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতাপের প্রশ্নে ক্ষুব্ধ শক্তের পুনরায় প্রতাপকে পরিত্যাগ পূর্বক সেলিমের উদ্দেশে যাত্রা করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে শক্তের মুঘলদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করে প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হবার অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায় প্রতাপকে অনুসরণকারী দুজন মুঘল সৈন্যকে হত্যাপূর্বক শক্ত তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন এবং এইরূপে দীর্ঘ বৈরিতার অবসানে দুই ভ্রাতার মিলন হয়েছিল সাধিত।

উপন্যাসে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রতাপের বর্ণনায় দেখা যায়:

"The dying hero is represented in a lowly dwelling; his chief, the faithful companions of many a glorious day, awaiting round his pallet the dissolution of their Prince, when a groan of mental anguish made Saloombra inquire, "what afflicted his soul that it would not depart in peace?" ৩২

শেষপর্যন্ত শালুম্ব্রার প্রশ্নে প্রতাপকে মেবারের গৌরব রক্ষা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ ও তজ্জনিত তাঁর বেদনা বোধের কারণ বিবৃত করতে দেখা গেছে। অবশ্য [illegible]পর উপস্থিত সকলকে মেবারের গৌরব রক্ষার ব্যাপারে প্রতাপকে নিশ্চয়তা দানের বর্ণনায় উপন্যাসের সঙ্গে টডের বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়ে থাকে।

রোহিণীকুমার [illegible] গুপ্ত প্রণীত 'চণ্ড [illegible] ক্রম' উপন্যাসটি ১২৯৩ সালে [illegible] লেখা। 'রাজস্থানে' বর্ণিত লাক্ষ রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডের [illegible] পূ[illegible] চ[illegible] [illegible] [illegible]দশপ্রেম ও নির্লোভ আচরণকেই মুখ্যত উপ[illegible] স[illegible] [illegible]ত [illegible] অবশ্য 'রাজস্থানে' বর্ণিত চণ্ডের উপাখ্যানের আনু[illegible] [illegible] অনুসরণ [illegible]ন্যাসে অনুপস্থিত। 'রাজস্থানে'

রাঠোর-অধিপতি রণমল্লের চক্রান্তে যুবরাজ রঘুদেবের হত্যার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে রঘুদেবের হত্যাকাহিনী বর্ণিত হয়নি। বরং রাঠোর-রাজ রণমল্লের অধিকার থেকে চিতোর রক্ষার্থে রঘুদেবকে শেষ পর্যন্ত চণ্ডের সাহায্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

উপন্যাসে যশল্মীরের মহারাজ চন্দনসিংহের পত্নী কর্তৃক রণমল্লের হত্যাকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'রাজস্থানে' কিন্তু চণ্ডের সৈন্যদের হাতে তার মৃত্যুর বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। চণ্ডকে হত্যার জন্য রণমল্লের বারংবার প্রয়াসের বিবরণ লেখকের স্বকল্পিত। উপন্যাসে বর্ণিত সর্দাররাজ দয়ালসিংহের কন্যা কিরণের বাল্য-প্রণয়ের বিবরণও 'রাজস্থানে' অনুপস্থিত। আবার, মান্দুরাজ গম্ভীরসিংহের কন্যা হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে চণ্ডের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও লেখকের স্বাধীন সংযোজন।

চিতোর রাজ্ঞীর এক পরিচারিকার প্রতি রণমল্লের আকৃষ্ট হওয়ার বিষয় 'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে চন্দনসিংহের পত্নীর প্রতি রণমল্লের আসক্তি ও তার সতীত্ব-হরণ বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে লেখক কোন সময়েই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন নি। উপন্যাসটি সুবৃহৎ এবং ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে পরিস্ফুট। বঙ্কিমের অনুসরণে লেখক প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার কাব্য, অবকাশরঞ্জিনী, মেঘনাদবধ কাব্য, সীতাহরণ নাটক, **Shakespeare**-এর বিভিন্ন রচনা থেকে নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

লেখক রচনার মাঝে-মাঝেই পাঠককে সম্বোধন করেছেন। উপন্যাসের বাক্যগুলি নাতিদীর্ঘ।

স্থানে স্থানে ভাষায় সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ বাহুল্য লক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের ব্যবহারও অত্যধিক। লেখকের প্রকৃতি ও মানুষের বর্ণনা-নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

গার্হস্থ্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে খ্যাত হারাণচন্দ্র রক্ষিত 'রাজস্থানে'র বিষয় অবলম্বনেও উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বাঙ্গালার বারভুঁইয়ার অন্যতম 'প্রতাপাদিত্যে'র জীবন অবলম্বনে 'বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্য' (১৮৭৯) উপন্যাসটি রচনার পর রাজপুত জাতির গৌরব রানা প্রতাপের অলৌকিক জীবন অবলম্বনে একখানি উপন্যাস রচনায় লেখক অভিলাষী হন এবং তারই ফলশ্রুতি 'মন্ত্রের সাধন' উপন্যাসখানি। উপন্যাসটি রচনার অভিপ্রায় বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য—'বঙ্গের প্রতাপ যাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, আশা আছে, "ভারতের প্রতাপ" আরও অধিক পরিমাণে তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। কেননা, 'মন্ত্রের সাধন' সেই স্বদেশ প্রেমিক পুরুষসিংহ প্রাতঃস্মরণীয় রানা প্রতাপের কর্মময় জীবনের পুণ্য প্রতিকৃতি!' গ্রন্থটি রচনার উৎস বিষয়ে লেখকের স্বীকারোক্তি: 'মনস্বী টডের রাজস্থান আমার প্রধান অবলম্বন।'

'মন্ত্রের সাধন' উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩০৫। গ্রন্থটি রচিত হবার মাত্র পাঁচ বছর পরেই গোয়ালিয়র রাজ্যের পণ্ডিত বনোয়ারীলাল তেওয়ারী 'বীরব্রত পালন' নামে এর হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নামপত্রে লেখক টডের গ্রন্থ থেকে প্রতাপ সম্পর্কিত বহুল পরিচিত উদ্ধৃতিটি মুদ্রিত করেছেন:

"There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap, some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermophylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon." ৩৩

উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম 'ব্রতগ্রহণ'। এই খণ্ডটি দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের নামকরণ করা হয়েছে 'ব্রতপালন'। এই খণ্ডটি চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। তৃতীয় খণ্ডটির নাম 'ব্রত উদ্যাটন বা অবসান'। এটি মাত্র দুটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। গ্রন্থের সূচনাপর্ব চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। লেখক এই

পর্বের নামকরণ করেছেন 'উদ্বোধন।' উদ্বোধন পর্বে রানা প্রতাপের সিংহাসন আরোহণ এবং 'আহেরিয়া' উপলক্ষে সহোদর শক্তসিংহের সঙ্গে প্রতাপের বিবাদের বিষয়টি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন লেখক।

চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় জগমলকে সিংহাসনচ্যুত করে প্রতাপকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়টি লেখক টডের অনুসরণেই রচনা করেছেন। টডের বর্ণনায় বলা হয়েছে :

'...Rawut kistna entered, accompanied by the ex-prince of Gwalior. Each chief took an arm of Jugmal, and with gentle violence removed him to a seat in front of the 'cushion' he had occupied ; the hereditary premier remarking, 'you had made a mistake, Mahraj ; that place belongs to your brother ;" and girding Pertap with the sword (the privilege of this house), thrice touching the ground, hailed him king of Mewar.' [৩৪]

টড যেখানে প্রতাপকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে রাওয়াৎ কৃষ্ণ এবং গোয়ালিয়রের প্রাক্তন রাজকুমারের সমবেত প্রয়াসের বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে লেখক একমাত্র রাওয়াৎ কৃষ্ণের বিষয়েই উল্লেখ করেছেন। তবে 'আহেরিয়া' উপলক্ষে শক্তসিংহের সঙ্গে প্রতাপের বিরোধের বিষয়টি টডের অনুসরণেই বর্ণিত।

'ব্রতগ্রহণ' নামক খণ্ডে লেখক চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত প্রতাপের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন, তারসবই টডের বর্ণনানুগত। রাজা মানসিংহের স্বেচ্ছায় রানা প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণ এবং তাঁর ভোজনের সময় প্রতাপের স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যেকার বিরোধের সূত্রপাতের বিষয়টিও 'রাজস্থান' অনুসরণেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবে

ভোজনের সময়ে প্রতাপকে উপস্থিত করার ব্যাপারে মানসিংহের বারংবার অনুরোধজ্ঞাপন, তাঁর আত্মমর্যাদাবোধকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। বলাবাহুল্য রাজা মানের এতাদৃশ অনুরোধজ্ঞাপন লেখকের স্বেচ্ছাকৃত।

হলদিঘাটের যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঝালাপতি মান্নার প্রতাপের রাজচ্ছত্র-ধারণপূর্বক স্বেচ্ছায় সংগ্রামে আত্মোৎসর্গের কাহিনী, প্রভুভক্ত চৈতকের প্রতাপসহ পার্বত্য নদী অতিক্রমণ, চৈতকের মৃত্যু, শক্তসিংহের দ্বারা প্রতাপের অনুসরণকারী দুজন মুঘল সৈন্যের হত্যা এবং এইরূপে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রতাপের জীবন রক্ষা—সবই লেখক টডের গ্রন্থানুসরণেই রচনা করেছেন। তবে সেইসঙ্গে কিছু কিছু অতিরঞ্জন এবং লেখকের স্বকপোলকল্পিত বিবরণও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রতাপের মহতী জনসভায় ভাষণদান, পত্নী লছমীদেবীর আদর্শবাদ—স্বামীকে উৎসাহদান, বিষাক্ত সর্পের প্রস্তরে দংশনের দৃশ্য দর্শনে শক্তসিংহের প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় উৎসাহ লাভ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ্য। তবে এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

'মন্ত্রের সাধন বা রানাপ্রতাপ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইলেও ইতিহাস নহে……।'

তবু হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের নির্ভীকতা তথা সাহসিকতা প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে নিঃসঙ্গ প্রতাপের শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ এবং শত্রু সৈন্য হত্যার বর্ণনা যে অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট, তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিকানীর রাজ পৃথ্বীরাজের পত্নী জ্যোৎস্নার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের ভগ্নী যমুনার রঙ্গালাপ অনেকটা পাঠককে Relief দানের জন্যই রচিত। বলাবাহুল্য এই রঙ্গালাপের বিবরণ সম্পূর্ণভাবে লেখকের স্বকপোলকল্পিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত পৃথ্বীরাজ ও তাঁর পত্নীর রহস্যালাপও লেখকের স্বাধীন সংযোজন। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সংযোজিত নরোজার বিস্তৃত বর্ণনা, সপ্তম

পরিচ্ছেদে বর্ণিত বাদশাহকন্যার সঙ্গে পৃথ্বীরাজ পত্নীর বিবাদ, অষ্টম পরিচ্ছেদে জনৈকা অস্ত্র বিক্রয়কারিণীর নিকট থেকে আত্মসম্মান রক্ষার্থে জ্যোৎস্নার ছুরিকা ক্রয় প্রভৃতি বিষয়গুলিও লেখকের স্বাধীন সংযোজন। আবার বিপরীত ক্রমে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত পরাজিত প্রতাপের মর্মন্তুদ বিবরণ, সপ্তদশ পবিচ্ছেদে তৃণবীজে প্রস্তুত রুটি বন-বিড়াল কর্তৃক অপহৃত হলে প্রতাপের বালিকা কন্যাব মর্মভেদী ক্রন্দন এবং এই ঘটনায় প্রতাপের গভীরভাবে অভিভূত হওয়া ও পরিণামে আকবরের সঙ্গে সন্ধি করার ব্যাপারে সম্মত হওযা, কিংবা অষ্টাদশ পবিচ্ছদে বর্ণিত পৃথ্বীরাজ কর্তৃক আকবরের কাছে প্রতাপের সন্ধি প্রার্থনা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করার বিষয়, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে প্রতাপের সিন্ধুনদ অভিমুখে যাত্রা, ত্রয়োবিংশ পবিচ্ছেদে প্রতাপকে রাজমন্ত্রী ভামসা কর্তৃক প্রভূত অর্থদান, পবিণামে প্রতাপের শক্তি সঞ্চয় ও বত্রিশটি দুর্গের পুনরধিকার, অম্বরেব প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্রের লুণ্ঠন ইত্যাদির বর্ণনা যে 'রাজস্থান' গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী তা লক্ষ্য করা যায়।

এমনকি নবম পরিচ্ছেদে সম্রাট আকবরের চারিত্রিক দুর্বলতার যে চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও লেখক টডেব ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন লক্ষিত হয়। সম্রাট আকবরের পৃথ্বীরাজ পত্নীর শালীনতা হানির প্রয়াস বিষয়ে বর্ণনার পূর্বে লেখক বলেছেন:

'জগৎ-জোড়া যাঁর নাম,—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া যিনি হিন্দু—মুসলমানের নিকট সমান শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন,—সত্যের অনুরোধে, আজ তাঁহার কলংক—কালিমা, এই কাব্য চিত্রে ঢালিতে হইল। এ-কলঙ্ক দুরপনেয়, তাই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আলোকের পার্শ্বে ছায়া তেমনি রাজ-রাজেশ্বর মোগল-সম্রাটের সেই 'নরোজা' কাহিনীটি বর্ণন করিয়া, আমার এই কাব্যগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা করিব। আকবর ভক্ত পাঠক-পাঠিকা, লেখকের এই অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।'

উপন্যাসটির তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট প্রতাপের দৃষ্ট

স্বপ্নের বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়। এই স্বপ্নের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব সংযোজন। বলাবাহুল্য এরূপ ঘটনার সংযোজন উপন্যাসের বিচারে অপরিহার্য ছিল না। নিছক তৎকালীন ইংরাজ সরকারের স্তুতি বন্দনার জন্যই মূলকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্করহিত, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এই স্বপ্ন দৃশ্যের অবতারণা। পরিশেষে বলতে হয়, মোটের উপর সুপাঠ্য হলেও উপন্যাসটি লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্য ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের আতিশয্য দোষে দুষ্ট।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০১ বঙ্গাব্দে) 'পদ্মিনী' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের নামপত্রে লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি। লেখক উপন্যাসের পূর্বে 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গে' যদিও আলাউদ্দীনের নিছক পদ্মিনী লাভের আশায় চিতোর আক্রমণের ঘটনাকে সত্য ও যুক্তি-সঙ্গত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তথাপি উপন্যাসে আলাউদ্দীনের পদ্মিনী লাভের আশায় চিতোরআক্রমণের কাহিনীকেই রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসটি নিতান্ত ক্ষুদ্র। লেখক উপন্যাসটির বিষয় যে টডের গ্রন্থ থেকেই গ্রহণ করেছেন গ্রন্থের নামপত্রেই তার স্বীকৃতি বিদ্যমান।

সীতানাথ চক্রবর্তী প্রণীত 'সরোজ সুন্দরী' উপন্যাসটি ১৩১৯ সালে প্রকাশিত। লেখক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করে বলেছেন:

"...রাজস্থানাদি পুরাবৃত্তাবলম্বনে প্রাচীন আর্য্যকীর্তি প্রচার তাদৃশ মহৎ জাতির গৌরব ঘোষণা, রাজপুত বীর কেশরীগণের বীরকীর্তি প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য।..."

উপন্যাসটি চতুর্থ খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে উদয় সিংহের বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণলাল কর্তৃক দস্যু সর্দারের উত্তরাধিকারী স্বরূপ প্রভূত বিত্তের অধিকারী হওয়া, দস্যুগণ কর্তৃক কৃষ্ণলালের আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে।

'সরোজ সুন্দরী' উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী অপেক্ষা অনৈতিহাসিক ঘটনা রাজির বাহুল্যই অধিক। উদয়ের যে রক্ষিতার কথা 'রাজস্থানে' উল্লিখিত হয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসে সেই রক্ষিতাকে 'অরুণা' বলে অভিহিত করে সমগ্র উপন্যাসে তারই আধিপত্য বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের নামকরণ উদয়ের বিবাহিতা পত্নী শনিগুরু সর্দার অখিল রাওয়ের দুহিতা 'সরোজ সুন্দরী'র নামে হলেও সরোজ সুন্দরীর ভূমিকা যে নিতান্তই সীমিত, তার উল্লেখ করতে হয়।

অরুণার সঙ্গে উদয়ের যোগাযোগ এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যে বিবরণ উপন্যাসে প্রকাশিত, তা সম্পূর্ণ লেখকের স্বকপোলকল্পিত. কারণ উদয়ের রক্ষিতার কথা 'রাজস্থানে' বর্ণিত হলেও উদয়ের সঙ্গে রক্ষিতাটির সম্পর্ক স্থাপনের সূত্র বিষয়ে কিছুই উল্লিখিত হয়নি।

উপন্যাসে সম্রাট আকবরের দু'বার চিতোর আক্রমণের বিষয় 'রাজস্থান' অনুসরণেই বর্ণিত। কিন্তু উপন্যাসে উদয়ের বন্দী হবার বিবরণ অনুপস্থিত। উদয়ের উপপত্নী কর্তৃক আকবরের পরাজিত হবার বিবরণ 'রাজস্থান' অবলম্বনেই রচিত। উদয়ের উপপত্নীর বীরত্বে তার প্রতি রাজপুত সর্দারের আক্রোশ 'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে বলা হয়েছে যে, উপপত্নী বিশেষভাবে রানাকে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে স্বয়ং বিষপানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে যে রাজপুত সর্দারের দ্বারাই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

চিতোর যুদ্ধের বর্ণনা 'রাজস্থান' অবলম্বনেই বর্ণিত। বীরবর শহিদাস কর্তৃক চিতোরের প্রধান তোরণদ্বার রক্ষার প্রয়াস, দ্বিতীয়বার আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রমণের পূর্বেই ভীত রানার চিতোর রক্ষার্থে দেবলের বংশধর ঝালোরপতি শোনিগুরুরাও, ঈশ্বরদাস রাঠোর, গোয়ালিয়রের তুয়ার নৃপতি, বৈদলা ও কোটারিয়ো নামক জনপদ থেকে আগত পৃথ্বীরাজের বংশোদ্ভূত বীর প্রামার, ঝালাপতি

প্রভৃতির অংশ গ্রহণ সর্বোপরি জয়মল ও পুত্তের বীরত্বসহকারে চিতোর রক্ষার প্রয়াস, তৎসহ পুত্তজননীর আপন পুত্রবধূসহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিবরণ 'রাজস্থান' থেকে আহৃত।

উপন্যাসে লেখক উদয় চরিত্রটিকে একটু ভিন্নরূপে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রাজপুত ইতিহাসের কলংক বলে পরিচিত উদয়ের প্রতি লেখকের সহানুভূতি সত্ত্বেও তার প্রতি পাঠকের বিন্দুমাত্র সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। বরং বিলাসী, ভীত, কর্তব্যকর্মে বিমুখ উদয়কে চিতোর সিংহাসনের অনুপযুক্ত বলেই মনে হয়। অতএব লেখকের মন্তব্য :

'বাস্তবিক দেখিতে গেলে অনুমিত হইবে যে, বিবিধ ঘটনাচক্রে পড়িয়া, নানা প্রকার অশান্তিতে ও শোকে মুহ্যমান হইয়া তৎকালে তিনি (উদয়) মতিস্থির রাখিতে পারেন নাই।'—যথার্থ নয়।

উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

'একদিন অরুণা কাঁদিতে কাঁদিতে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। দুইবার লিখিল, দুইবার ছিঁড়িল। লেখা মনের মত হয় না। লিখিবার ভাষা মিলে না। চ'খের জলে লেখা মুছিয়া যায়। অনেক পরে পত্র শেষ করিয়া রাখিয়া দিল। তারপর পা ছড়াইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল।'

দয়ালচন্দ্র ঘোষ রচিত 'হামির' উপন্যাসটি (১৯১৫) দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি বিংশ পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি একবিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। লেখক উপন্যাসের প্রথমেই বলেছেন, 'উপন্যাস ইতিহাস নহে। প্রচলিত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত ইহার একটু আধটু গরমিল হইয়াই থাকে। তবে বিষম বিপর্যয়টা অবশ্যই পরিহার্য্য—এই পুস্তকে এই বিধি লঙ্ঘিত হয় নাই।'

বাস্তবিক, লেখক উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে 'রাজস্থানে' বর্ণিত আখ্যানের গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেননি, মোটামুটিভাবে 'রাজস্থানে' বর্ণিত হামির কর্তৃক চিতোর উদ্ধারের কাহিনীকেই উপস্থাপিত করা হয়েছে।

অরিসিংহের বিবাহ, অজয়সিংহ কর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরকে চিতোরের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন, অজয়সিংহের পুত্রদ্বয়ের মন দুঃখে দেশত্যাগী হওয়া, কনিষ্ঠ সুজনসিংহের দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ, হামির কর্তৃক ভীল সর্দার মুঞ্জের হত্যাসাধন—সকলই টডের বর্ণনানুসারে রচিত।

মালদেব কর্তৃক স্বীয় কন্যার সঙ্গে হামিরের বিবাহদানের প্রস্তাব, হামিরের সেই প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন, মাত্র পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ হামিরের বিবাহের উদ্দেশ্যে চিতোর যাত্রা, রাজপ্রাসাদে পূর্বপরিকল্পিত বিবাহের অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের বিবরণাদিও টডের অনুসরণেই উপস্থাপিত। এমন কি মালদেবের অনুরোধমত দিল্লীশ্বর মহম্মদ কর্তৃক চিতোর আক্রমণ এবং হামির কর্তৃক পরাজিত হওয়ার বিবরণও টডের বর্ণনানুগত।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য লেখককে সম্পূর্ণ অভিনব বিষয়ের সংযোজন করতে কিংবা 'রাজস্থানে'র বিবরণের কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটাতে লক্ষ্য করা গেছে। হামিরের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে শৈশবাবস্থায় মালদেবের কন্যার বিবাহ ও তার অকাল বৈধব্যদশা-প্রাপ্তির বিষয়ে টড উল্লেখ করলেও লেখক উপন্যাসে মালদেবের কন্যার শৈশবে বিবাহদানের এক কল্পিত কারণ বর্ণনা করেছেন—

'আমার জন্মিবার পূর্বে আমার কয়েকটি সহোদরা অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। ভিন্ন কুলস্থা করিলে কন্যাটি বাঁচিতে পারে এই সংস্কারে আমার বয়স বৎসরাধিক না হইতেই মাতার একান্ত আগ্রহে পিতা আমাকে কোন ভট্টি বংশীয় রাজকুমারের সহিত বিবাহবদ্ধ করেন।'

টডের বর্ণনায় অজয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র আজিমসিংহের কৈলবারায় অকালে দেহত্যাগের বিষয় বর্ণিত হলেও লেখক তাঁর উপন্যাসে এ ব্যাপারে নূতন তথ্য পরিবেষণ করেছেন। উপন্যাসে হামিরের সঙ্গে মালদেবের বিধবা কন্যার বিবাহদানের বিষয় উল্লিখিত হলেও লেখক কিন্তু উপন্যাসে

মালদেবের কন্যা শিবানীর সঙ্গে হামিরের বিবাহদানের প্রসঙ্গটিকে অত্যন্ত কৌশলে যুক্ত করেছেন। এমন কি আলোচ্য উপন্যাসে শিবানী বিবাহের পূর্ব থেকেই হামিরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন দেখা যায়। মালদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিসিংহ কর্তৃক চিতোর দুর্গ প্রাসাদে হামিরকে অন্তরীণ করার বিষয়টি অভিনব। হামির কর্তৃক চিতোর বিজয়ের সমগ্র কাহিনীটিই লেখকের স্বকপোলকল্পিত। টডের বর্ণনায় এবিষয়ে কিছুই উল্লিখিত হয়নি। লেখক উপন্যাসে সেই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধের বিবরণও সম্পূর্ণভাবে লেখকেরই কল্পনাপ্রসূত।

উপন্যাসটির ভাষা বেশ সাবলীল। কাহিনী উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গীর চমৎকারীত্ব লক্ষণীয়। স্থানে স্থানে উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্যও উল্লেখযোগ্য—

ক) দূরস্থ চারণভূমি অতি শুভ্র মেঘে ঢাকা গগনখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ক্রমোন্নত অরণ্যের উপর স্থানে স্থানে খদ্যোতের বিকাশে মনে হইতেছে, যেন প্রকৃতি দেবী একখানা চুমকি—বসান সাদা কাপড় পরিয়া আনত দেহে দাঁড়াইয়া আছেন।

খ) হৃদয় প্রস্রবণ হইতে বাহির হইয়াই যুবার প্রণয় নদীকে একটা প্রকাণ্ড পাথরের সহিত লড়াই করিতে হইল।

বরদাকান্ত মজুমদার রচিত 'কর্মদেবী' উপন্যাসটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে অনঙ্গদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সাধুর বীর্যবত্তা, সাধু কর্তৃক যবন বিতাড়ন, ঔরিণ্টরাজ-দুহিতা কর্মদেবীর বিবাহ প্রস্তাবনার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে অনঙ্গদেবের পুত্র সাধুর ঔরিণ্টরাজের আতিথ্য গ্রহণ, ঔরিণ্টরাজ মানিক রায়ের সাদর অভ্যর্থনা, সাধুর অপূর্ব বীর্যবত্তা প্রদর্শন ও পরিশেষে কর্মদেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে রাঠোরকুমার অরণ্যকমলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাধু ও অরণ্যকমলের মৃত্যুবরণ ও পতির চিতায় কর্মদেবীর আত্মবিসর্জন বর্ণিত হয়েছে।

টডের 'রাজস্থানে' যশল্মীরের ভট্টিরাজের অধীনস্থ পূগলনামক জনপদ অনঙ্গদেবের পরিবর্তে রণঙ্গদেব-নামক জনৈক ভট্টিসর্দারের হস্তে সমর্পিত ছিল বলা হয়েছে। 'রাজস্থানে'ও অনঙ্গদেবের পুত্রকে 'সাধু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে 'রাজস্থানে' সাধুকে লুণ্ঠনকারীরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। উপন্যাসে সাধু কর্তৃক মানিক রায়ের আতিথ্য গ্রহণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। সাধু স্বেচ্ছায় তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু 'রাজস্থানে' মানিক রায় কর্তৃক সাধুকে আমন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। 'রাজস্থানে'ও মানিক রায়ের কন্যাকে 'কর্মদেবী' বলা হয়েছে। কর্মদেবীর সঙ্গে মুন্দরাধিপ রাও চণ্ডের চতুর্থ তনয় অরণ্যকমলের বিবাহ ও এই বিবাহে কর্মদেবীর অসম্মতি 'রাজস্থান' অবলম্বনেই বর্ণিত হয়েছে।

সাধু ও অরণ্যকমলের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, কর্মদেবী কর্তৃক নিজের একটি হস্তছেদনপূর্বক শ্বশুর সন্নিধানে প্রেরণ করা ও মৃত পতির সহগামিনী হওয়া—সবই 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধুর যে বীর্যবত্তা প্রদর্শনের বর্ণনা আছে, সেগুলির সবই লেখকের স্বকপোলকল্পিত। কর্মদেবীর পতি-ভক্তি ও অদ্বিতীয় সাহসিকতা 'রাজস্থান' অবলম্বনেই চিত্রিত হয়েছে।

কর্মদেবীর কাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীগত ঐক্য বিদ্যমান। একজনকে বিবাহে দু'জনের পাণিপ্রার্থী হওয়া ও পরিণামে বিরোধে লিপ্ত হওয়া দু'টি কাহিনীরই বর্ণনীয় বিষয়। তবে কর্মদেবী কৃষ্ণকুমারীর মত নিরীহ ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না।

লেখক আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীটি 'রাজস্থানে'র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'মা বা ' থেকে গ্রহণ করেছিলেন। অরণ্য-কমলের তরবারির আঘাতে সাধুর মৃত্যুবরণও 'রাজস্থানে' উপস্থিত।

মনোমোহন রায় বিরচিত 'সতীর মূল্য' নাট্যোপন্যাসখানি ১৩২৯ সালে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে এটি উপন্যাস, কিন্তু মাঝে মাঝে নাটকের ন্যায় দীর্ঘ অংশ সংলাপে রচিত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটি উষা পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবং নিশা এই চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। মূলতঃ উপন্যাসটিতে আকবরের সঙ্গে প্রতাপের বিরোধ বর্ণিত হয়েছে। স্বভাবতঃই প্রতাপের মহান ত্যাগ, অতুলনীয় বীর্যবত্তা, অদ্বিতীয় দেশপ্রেম প্রভৃতই উপন্যাসখানির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। লেখক যে 'রাজস্থানে'র বসুমতী সংস্করণ থেকে তাঁর গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তার পরিচয় গ্রন্থের পাদটীকায় বিদ্যমান।

উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে 'সতীর মূল্য'। উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে :

তুমি (প্রতাপ) না রক্ষিলে কে রাখিবে
হিন্দু রমণীর সতীত্ব রতন ? ওই
দেখ—অম্বরের পতি অম্লানবদনে
করিতেছে তুর্কী পদসেবা। বিকানীর
অধিপতি রায়সিংহ মুণ্ডিত অধরে
মৃদু মন্দ হাসি, আকবরের নৌরোজায়
প্রেরিছেন আপনার বনিতায় অমূল্য
সতীর মূল্যে ক্রয় করি অতি তুচ্ছ
রাজার প্রসাদ। রাণা : হের যোধপুর,
হের মাড়বার—কলঙ্ক—কালিমা—লিপ্ত
সবার বদন। একমাত্র তুমি, রাণা;
রাজপুত—রাজন্য—সমাজে রহিয়াছ
উচ্চশির হিমগিরি শৃঙ্গের মতন।

—কিন্তু উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নামকরণটি যথাযথ হয়েছে বলে মনে হয় না।

মনোমোহন রায় বিরচিত 'সতীর মূল্য' উপন্যাসখানি মূলতঃ 'জাগরিতা'রই এক নবতর সংস্করণ 'জাগরিতা' যেখানে আদ্যন্ত কাব্য-সংলাপে রচিত, 'সতীর মূল্য' সেক্ষেত্রে আদ্যন্ত কাব্য সংলাপের পরিবর্তে কিছু অংশ গদ্যে রচিত। গ্রন্থের পদ্যছন্দে বর্ণিত অংশগুলি সম্পূর্ণই 'জাগরিতা' থেকে নেওয়া, এমনকি সঙ্গীতগুলি পর্যন্ত তবে মানসিংহকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে সেই চক্রান্তেই আকবরের মৃত্যুর বিবরণটি 'সতীর মূল্যে' সব শেষে বর্ণিত হলেও 'জাগরিতা'য় প্রতাপের মৃত্যুর পূর্বেই তা বর্ণিত হয়েছে।

পাদটীকা

১. বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস; অর্পণা প্রসাদ সেনগুপ্ত; পৃঃ ৮২
২. Annals and Antiquities of Rajasthan; Vol I Chap V; Page 214
৩. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (২য় সংস্করণ); ডঃ বিজিতকুমার দত্ত; পৃঃ ১৭৫
৪. Annals and Antiquities of Rajasthan; Vol I; Chap V; Page 215
৫. Ibid; Vol I; Chap V; Page 214
৬. Ibid; Vol I; Chap V; Page 217
৭. Ibid; Vol I; Chap V; Page 217
৮. Ibid; Vol I; Chap V; Page 215
৯. Ibid; Vol I; Chap V; Page 215
১০. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (২য় সংস্করণ); ডঃ বিজিতকুমার দত্ত; পৃঃ ১৭৭
১১. স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য; ডঃ পশুপতি শাসমল; পৃঃ ১৬৯-১৭০
১২. Annals and Antiquities of Rajasthan; Vol I; Chap II; Page 186
১৩. Ibid; Vol I; Chap II; Page 186

১৪. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 186

১৫. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 186

১৬. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 186

১৭. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 186

১৮. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ; (২য় সংস্করণ) ; ডঃ বিজিতকুমার দত্ত ; পৃঃ ১১৯

১৯. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap II ; Page 186

২০. 'বিদ্রোহ উপন্যাসে ইতিহাসের দুই একটি পাত্রপাত্রী থাকিলেও উহা ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়'—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ; ডঃ সুকুমার সেন ; পৃঃ ১৩১

২১. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ; (২য় সংস্করণ) ; ডঃ বিজিতকুমার দত্ত ; পৃঃ ১৮৮

২২. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ; (৪র্থ সংস্করণ) ; ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ২৮৫

২৩. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ; ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ৪৯-৫০

২৪. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XIII ; Page 304-305

২৫. Ibid ; Vol I ; Chap XIII ; Page 309

২৬. Ibid ; Vol I ; Chap XIII ; Page 304-305

২৭. Ibid ; Vol I ; Chap XIII ; Page 308

২৮. Ibid ; Vol I ; Chap XIII ; Page 308

২৯. Ibid ; Vol I ; Chap XIII ; Page 309

৩০. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XIII ; Page 310

৩১. My favourite authors ; Wednesday Review ; Trichinopoly 23 Aug. 1905

৩২. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap XI ; Page 282

৩৩. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 283

৩৪. Ibid ; Vol I ; Chap XI ; Page 269

ষষ্ঠ অধ্যায়

টডের 'রাজস্থান' ও বাঙ্গালা ছোটগল্প

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে বাঙ্গালায় নাটক, কাব্য, এবং উপন্যাস বহুল পরিমাণে রচিত হলেও এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছোট গল্প। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নবকাহিনী' এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'রাজকাহিনী'কে বাদ দিলে অপর কোন বিখ্যাত লেখককে 'রাজস্থান' অবলম্বনে ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হতে দেখা যায় নি। অবশ্য এই প্রসঙ্গে শশিচন্দ্র দত্তের উল্লেখ প্রয়োজন।

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের পরিবার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী শিক্ষায় দেশের মধ্যে গ্রহণ করেছিল এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এই বংশেরই শশিচন্দ্র দত্ত ছিলেন ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজী গল্প লেখক। ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে "The Times of Yore" নামে ইংরেজীতে একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। গল্পগুলির কয়েকটি টডের 'রাজস্থান' কাহিনী থেকে সংগৃহীত। কিন্তু অধিকাংশই মুঘল ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। পরবর্তীকালে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই গল্পগুলি বাঙ্গালায় অনূদিত হয়ে 'উপন্যাস মালা' নামে প্রকাশিত হয়। অনূদিত গ্রন্থে কিন্তু অনুবাদকের নাম উল্লিখিত হয় নি।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত 'নবকাহিনী' (১৮৯২) দশটি গল্পের একটি সঙ্কলন। স্বর্ণকুমারীর এটি প্রথম গল্প সংকলন। গ্রন্থটি 'স্বামিন্'-এর নামে উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট প্রথম চারটি গল্পের (কুমার ভীমসিংহ; ক্ষত্রিয় রমণী; ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি এবং সন্ন্যাসিনী) উপাদান 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত। বললে অত্যুক্তি হয় না যে, 'রাজস্থানে'র বিষয় অবলম্বনে পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুর রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোট গল্প রচনা করলেও 'রাজস্থানে'র বিষয় অবলম্বনে বাঙ্গালা ছোটগল্প রচনায় স্বর্ণকুমারীই প্রথম পথিকৃতের ভূমিকায় হয়েছিলেন অবতীর্ণ।

'টড তাঁর গ্রন্থে যে সকল ঘটনার আভাস বা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারীর অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম কল্পনাশক্তি তার মধ্যে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করেছে, ফলে ইতিহাস-অনুক্ত প্রসঙ্গ তাঁর গল্পের মধ্যে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে···টডের পদাঙ্ক অনুকরণ করে স্বর্ণকুমারী কেবলমাত্র রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন নি, সংক্ষিপ্ত সূত্রকে কোথাও বিস্তৃত করেছেন, কোথাও বিস্তৃতকে সংক্ষেপিত করেছেন প্রয়োজন মত।' [১]

কুমার ভীমসিংহ গল্পটি টডের বর্ণনানুসরণেই রচিত। তবে রাজসিংহের দুই মহিষী রাণী চঞ্চলকুমারী ও রাণী কমলকুমারীর নাম দু'টি লেখিকা প্রদত্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে ভীমসিংহ ও জয়সিংহের জন্মগ্রহণ,[২] পরবর্তীকালে জয়সিংহকে হত্যাপূর্বক নিশ্চিন্তে রাজসিংহাসনে উপবেশনের জন্য ভীমসিংহকে তরবারি দান, স্বেচ্ছায় ভীমসিংহের সিংহাসন ত্যাগ প্রভৃতি বিষয় টডের অনুসরণেই বর্ণিত হয়েছে।

মেবার রাজকুলের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কনিষ্ঠ সন্তান জয়সিংহের পায়ে রাজসিংহ কর্তৃক অমর কবচ বন্ধনের বিষয়টি গল্পে উল্লিখিত হলেও টডের বর্ণনায় এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়—

'It is customary for the father to bind round the arm of a new-born infant a root of that species of grass called 'amir dhob,' the 'imperishable' dhob, well known for its nutritive properties and luxuriant vegetation under the most intense heat' [৩]

গল্পে বর্ণিত হয়েছে যে রানা ভৃত্যদের কথায় বিভ্রান্ত হয়েই জ্যেষ্ঠ সন্তানের পরিবর্তে কনিষ্ঠ সন্তানকে 'অমর কবচ' পরিয়েছিলেন। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায় যে, জয়সিংহের মাতার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃই রানা স্বেচ্ছায় এই আচরণ করেছিলেন—

'The Rana first attached the ligature round the arm of the youngest, apparently an oversight, though in fact from superior affection for his mother.'

'ক্ষত্রিয় রমণী' গল্পটির ক্ষেত্রে লেখিকা যৎসামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে টডের বর্ণনার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন লক্ষিত হয়। মেবারের যুবরাজ অরিসিংহের শিকার উপলক্ষে বরাহ অনুসরণ করে ভুট্টাক্ষেত্রে উপনীত হওয়া, এক রাজপুত যুবতী কর্তৃক আত্মগোপনকারী বরাহের সন্ধানদান, যুবতীটির নিক্ষিপ্ত ইষ্টকে যুবরাজের অশ্বের আহত হওয়া, যুবরাজের যুবতীটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার অভিলাষ, যুবতীটির পিতা কর্তৃক যুবরাজের অভিপ্রায় অগ্রাহ্য হলেও শেষ পর্যন্ত যুবতীর মাতার ইচ্ছায় রাজকুমারের সঙ্গে যুবতীটির পরিণয় সাধন—এ সবই টডের বর্ণনানুগত। কিন্তু গল্পে বর্ণিত যুবরাজের আহত ঘোড়ার ক্ষতস্থানে রাজপুত যুবতীর ওষুধ লেপন লেখিকার নিজস্ব সংযোজন। যুবরাজের ইচ্ছাপূর্বক দুগ্ধের কলস বহনকারী যুবতীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এবং পরিণামে রাজকুমারের অশ্ব থেকে পতনের বিবরণ মূল ঘটনার ঈষৎ রূপান্তর। টডের বর্ণনায় দেখা যায় রাজকুমারের এক সহচর রাজপুত যুবতীটির সঙ্গে ইচ্ছাপূর্বক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পরিণামে অশ্ব থেকে হয়েছিল পতিত—

'It was proposed, in frolic, to overturn her milk, and one of the companions of the Prince dashed rudely by her; but without being disconcerted, she entangled one of her charges with the horse's limbs, and brought the rider to the ground.' [৫]

'ভুঁড়িদারজি' নামক কৌতুক চরিত্রটির সংযোজন সম্পূর্ণভাবে লেখিকার স্বকপোলকল্পিত। সময়সীমার বর্ণনাতেও লেখিকার স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। টডের বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাজপুত যুবতীর ক্রিয়া-কলাপে আকৃষ্ট হয়ে যুবরাজ অরিসিংহ পরদিনই একইস্থানে এসে

উপস্থিত হয়েছেন এবং তার পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। অথচ লেখিকা তাঁর গল্পে ঘটনাকালকে হ্রাস করে একটি দিনের কিছু অংশে পরিণত করেছেন। পরিণামে রচনাটিতে তীব্রগতি সংযুক্ত হয়েছে।

'ক্ষত্রিয় রমণী' গল্পটির প্রধান আকর্ষণ যুবতী চরিত্র। অপরপক্ষে রাজকুমার অরিসিংহ মধ্যযুগীয় প্রণয় কাহিনীর নায়কের মর্যাদা লাভ করেছেন। 'ক্ষত্রিয়রমণী' গল্পটির বিষয়বস্তু অন্যান্য একাধিক লেখকের রচনাতেও গৃহীত হতে দেখা গেছে। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রমেশচন্দ্র দত্ত এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রমেশ-চন্দ্রের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায়' 'আহেরিয়া' নামাঙ্কিত প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত চারণদেবের দ্বিতীয় গীতটিতে অরিসিংহের মৃগয়া কাহিনীটি ব্যক্ত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'তেও এই একই আখ্যায়িকা বর্ণিত হয়েছে। স্বভাবতঃই তাই আমাদের আলোচ্য লেখিকা ও শেষোক্ত দু'জনের রচনা সম্পর্কে এই আখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যেতে পারে। সমালোচক এই বিষয়ে যথার্থই মন্তব্য করে বলেছেন :

'রমেশচন্দ্রের রচনাটি নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন ও বর্ণনাসর্বস্ব কারণ টডের ইতিহাসের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে বর্তমান ক্ষেত্রে। অধিকন্তু স্বর্ণকুমারীর গল্পটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, রমেশচন্দ্রের রচনাটি একটি বৃহদায়তন উপন্যাসের সামান্য অংশ মাত্র। অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর মধ্যেও এই আখ্যায়িকা বর্ণিত হয়েছে, এবং তথ্যের দিক থেকে তিনিও একান্তভাবে টডের অনুসরণকারী। অথচ সরল বর্ণনাধর্মী কথকতা অবনীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া গেলেও ছোট গল্পের দিক থেকে তা দোষমুক্ত নয়; সর্বোপরি এই কাহিনী স্বতন্ত্র বা স্বয়ং নির্ভর নয়, হাম্বিরের জীবনচরিত বর্ণনার গৌরচন্দ্রিকায় লেখক অরিসিংহের বিবাহ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।'

রাজস্থানের বিষয় অবলম্বনে অপর যে গল্পটি রচিত, সেটি হ'ল 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি।' এই গল্পটি বহুলাংশে নাটকীয়তার

লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু কাহিনী-প্রধান এই গল্পটিতে বর্ণিত চরিত্রগুলি তেমন স্পষ্টতর হয়ে ওঠেনি স্বীকার করতে হয়। অবশ্য লেখিকার এই গল্পটি প্রায় তাঁর মৌলিক রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ, সংলাপ বর্ণনা এবং চরিত্র বিশ্লেষণে লেখিকা স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। আখ্যানের মূল বিষয় হল বুন্দিরাজ দেবসিংহের তাঁর বাহন 'পাথারে'র প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ এবং সম্রাট সেকেন্দর লোদীর অশ্বলোলুপতা। টড তাঁর গ্রন্থে দেবীসিংহের প্রাণাধিক প্রিয় অশ্ব পাথারের জন্ম বিবরণ এবং বংশ পরিচয় সন্নিবিষ্ট করেছেন। লেখিকা কিন্তু তাঁর গল্পে অবান্তর বিবেচনায় এই বৃত্তান্ত পরিহার করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখ্যতঃ শিল্পী এবং শিল্পগুরু রূপে খ্যাত হলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর যে একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল অবনীন্দ্রনাথের গদ্য রীতিকেই এর প্রধান কারণ রূপে অভিহিত করতে হয়। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনা একান্তভাবে রূপকথাধর্মী। গদ্য ও পদ্যের নির্দিষ্ট ভেদ রেখাটি তাঁর রচনায় অনেকাংশেই অন্তর্হিত।

অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। লেখকের গদ্যরীতির পরিণত প্রকাশ গ্রন্থখানিতে বিধৃত। সর্বমোট নয়টি গল্পের সংকলন এটি। সবক'টি গল্পের বিষয়বস্তু টড বিরচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এবং সবকটি গল্পেই টডের বিশ্বস্ত অনুসরণ লক্ষিত হয়। অবশ্য কিশোর পাঠ্যগ্রন্থ বলে লেখক একদিকে তাদের মনোরঞ্জনার্থে স্থানে স্থানে নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, অপরপক্ষে কিছু কিছু ঘটনা সংগত কারণেই পরিত্যক্ত হয়েছে। স্বাধীন সংযোজনের ক্ষেত্রে তিনি 'রাজস্থানে' বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে স্বকপোলকল্পিত বিষয়ের সঙ্গতি রক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত তাঁর অনুপম উপমা প্রয়োগ এবং আকর্ষণীয় চিত্রকল্প (imagery) রচনার উল্লেখ করতে হয়। ক্ষেত্র-বিশেষে নির্মল পরিহাস

প্রিয়তাও রচনার মাধুর্য গুণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। 'রাজস্থানে' বর্ণিত অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অনেকক্ষেত্রে বাস্তব সম্মত বর্ণনা দান করতেও লক্ষ্য করা যায়।

'রাজকাহিনী'তে শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, হাম্বির, চণ্ড, রাণাকুম্ভ ও সংগ্রাম সিংহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রাজপুত গৌরব রানা প্রতাপ। সম্ভবত বহু আলোচিত ও সর্বজন পরিচিত বলেই রানা প্রতাপের প্রসঙ্গটি লেখক বিষয়-সূচী থেকে বাদ দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ যে 'রাজকাহিনী'র জন্য বিশেষভাবে রাজপুতানার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকেই অবলম্বন করেছিলেন, তার কারণ নিহিত ছিল তাঁর স্বাদেশিক মানসিকতায়, যে মানসিকতা তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে লেখকের নিছক রোমান্সপ্রিয়তাকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। কিশোর পাঠকদের রাজপুতানার বীরত্ব, সাহসিকতা এবং মহত্তর ত্যাগের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার মহান উদ্দেশ্যেই তিনি মূলতঃ 'রাজকাহিনী' প্রণয়ন করেন।

'রাজকাহিনী'র কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক কেবলমাত্র ইতিহাসের রসকেই পরিবেশন করেননি, সেই সঙ্গে রূপকথার দুর্লভ রসও পরিবেশিত হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, লেখক ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও সেগুলি শেষ পর্যন্ত কালোত্তীর্ণ ও দেশোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। এইজন্যে নিতান্ত পরিচিত চরিত্র অথবা ঘটনার বর্ণনায়ও এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভূত হয়ে থাকে। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যেতে পারে, 'লেখক ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ ফেলিয়া রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগাইয়াছেন। ফলে কাছের জিনিস তথ্য বর্জন করিতে করিতে দূরে সরিয়া গিয়া রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে…।' [৭]

'রাজকাহিনী'র প্রথম গল্পটি 'শিলাদিত্য'। গল্পটিকে লেখকের প্রায় মৌলিক রচনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ 'রাজস্থানে' শিলাদিত্যের বিষয়ে যৎসামান্য উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু লেখক শিলাদিত্যের প্রসঙ্গকে বিস্তৃততর পরিসরে স্থাপন করে মোটামুটিভাবে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন।

বল্লভীপুরের সূর্যমন্দিরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সূর্য উপাসনা, সূর্যের বরে সুভাগার গায়েব—গায়েবীকে লাভ, সুভাগার অকাল মৃত্যুবরণ, গায়েবীসহ সূর্যমন্দিরের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া প্রভৃতি বিষয় লেখকের স্বাধীন কল্পনার পরিচয়বাহী।

তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সূর্যকুণ্ড থেকে প্রাপ্ত সপ্তাশ্ব চালিত রথে শিলাদিত্যের উপস্থিত হওয়া এবং কৃতিত্ব সহকারে যুদ্ধে জয়লাভের অধিকারী হওয়া, সর্বোপরি লোভী এক মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্যকুণ্ডের জল অপবিত্র হওয়ায় সপ্তাশ্ব চালিত রথলাভে ব্যর্থ শিলাদিত্যের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণের ঘটনা 'রাজস্থান' অনুসরণেই বর্ণিত।

'There was fountai Sur a Coonda' "Sacr d to the Sun" at Ballabhipura, from whic arose, at the summons of Silladitya (a cording to the leend) the seven headed horse Saptaswa, which draws the car of Surya to bear him to battle. With such an auxiliary no foe could prevail, but a wicked minister revealed to the enemy the secret of annulling this aid, by polluting the sacred fountain with blood This accomplished, in vain did the Prince call on Saptaswa to save him from the strange and barbarous foe : the charm was broken, and with it sunk the dynasty of Ballabhi'[৮]

গল্পে সূর্যকুণ্ডের জল গো-রক্তে দূষিত হয়েছিল বলে বর্ণিত হলেও টড এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু উল্লেখ করেননি। এতদ্ব্যতীত,

লেখক বল্লভীপুর আক্রমণকারী হিসাবে সিন্ধুপারের শ্যামনগরস্থিত 'পারদ' নামক অসভ্য যবনদের বিষয়ে উল্লেখ করলেও এই প্রসঙ্গে টড কিন্তু কিছুই দৃঢ়ভাবে বলেননি। টডের বর্ণনানুযায়ী—

'Who the 'barbarian' was that defiled with blood of kine the fountain of the sun, whether Gete, Parthian, or Hun, We are left to conjecture'[৯]

'গোহ' গল্পটিতে শিলাদিত্যের মরণোত্তর জাতক গোহের জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে রাজকুমার গোহের ব্রাহ্মনী কমলাবতীর দ্বারা লালিত পালিত হওয়া এবং পরিশেষে গোহের ভীলসর্দার মাণ্ডলিকের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত হওয়া—সকলই টডের বর্ণনানুগ।

টডের বর্ণনায় মাণ্ডলিকের হত্যার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে গোহের উপর—

'The Sequel fixes on Goha the stain of ingratitude, for he slew his benefactor.'[১০]

—অর্থাৎ এক্ষেত্রে গোহের চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথের গল্পে কিন্তু মাণ্ডলিকের মৃত্যুর ব্যাপারে গোহকে দায়ী করা হয়নি। বলা হয়েছে মাণ্ডলিক নিজেই পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছেন এবং পাথরের গায়ে লেগে গোহের নিকট থেকে গৃহীত ছুরি সজোরে তাঁর বক্ষে বিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুকে তরান্বিত করেছে। বলাবাহুল্য লেখক এইরূপে গোহকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ভীলরাজ মাণ্ডলিকের অনুজের চরিত্রটি লেখকের স্বকপোলকল্পিত। গোহ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধ মাণ্ডলিকের স্নেহকাতর চিত্তের দ্বন্দ্বটি রূপায়ণের ব্যাপারে লেখক যথার্থ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

'বাপ্পাদিত্য' গল্পটি নানাবিধ ঘটনার সমাবেশে আকীর্ণ। লেখকের বর্ণনার গুণে এবং কাহিনীর উপস্থাপনার নৈপুণ্যে গল্পটিতে সম্ভব-

অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, ইতিহাস ও রোমান্সের সহাবস্থান পাঠককে সম্মোহিত করে রাখে। ঘটনা সংস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখক বিরল মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রাখলেও টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত ঘটনারাজির সঙ্গে সমান্তরালভাবে কাল্পনিক ঘটনাবলীকেও স্থান দিয়েছেন।

গল্পটিতে হতভাগ্য ভীলদের উপর রাজপুত রাজাদের দীর্ঘ আট পুরুষ ব্যাপী অকথ্য অত্যাচারের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, রাজপুত রাজাদের শাসনে ভীলেরা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত ক্লান্ত। স্বভাবত:ই তাই তারা বিদেশী রাজপুতদের শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য হয়েছিল প্রয়াসী।

'রাজস্থানে' বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্যের মৃত্যুর বিষয়ে নিতান্ত সীমিত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। শিকারে ব্যাপৃত থাকার কালে তিনি নিহত হয়েছিলেন এই মাত্র টড উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গল্পে নাগাদিত্যের অত্যাচারী রূপটিকেই কেবলমাত্র পরিস্ফুট করা হয়নি, সেই সঙ্গে তাকে হত্যা করার অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে নাগাদিত্য কর্তৃক ভীলদের প্রাণাধিক প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ পশু শিকার বন্ধ করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

নাগাদিত্যের মৃত্যুকালে বাপ্পাদিত্যকে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুরূপে গল্পে বর্ণনা করা হলেও, টডের বর্ণনায় কিন্তু দেখা যায় সে সময়ে প্রকৃতপক্ষে বাপ্পার বয়স ছিল তিন বৎসর মাত্র। গল্পে ভীলদের আকস্মিক বিদ্রোহে একমাত্র শিশু সন্তান বাপ্পা সহ নাগাদিত্যের বিধবা মহিষীর যে অসহায় রূপটি চিত্রিত হয়েছে, তাও লেখকের স্বাধীন চিন্তার পরিচয়বাহী।

অসহায় বাপ্পার কমলাবতীর বংশধরের নিকট আশ্রয়লাভ এবং প্রথমে বীরনগর থেকে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের অপর এক ভীলের রাজত্বে, পরিশেষে গভীর পরাশর অরণ্য, চিত্রকূট পাহাড় প্রভৃতি পরিবেষ্টিত ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত নগেন্দ্রনগরে অধিকতর নিরপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণের বিবরণ 'রাজস্থান' গ্রন্থেও বর্ণিত।

ঝুলন পূর্ণিমার দিন বনমধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে শোলাংকী রাজকুমারীর সঙ্গে বাপ্পার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি মোটামুটিভাবে টডের বর্ণনানুসরণেই রচিত লক্ষিত হয়ে থাকে। তবে বাপ্পার বংশীবাদনের রবে রাজকুমারীর আকৃষ্ট হওয়া, হীরক খচিত বালার বিনিময়ে বাপ্পার নিকট থেকে ঝুলনা বাঁধার দড়ি সংগ্রহের প্রয়াস, বাপ্পা কর্তৃক রাজকুমারীর হাতে হীরকখচিত বালা পরিয়ে দেওয়ার ঘটনাগুলি লেখকের স্বাধীন সংযোজন। বরং টডের বর্ণনায় দেখা যায়—

'One frolic was as good as anot'er, and the scarf of the Solanki was United to the garment of Bappa, the whole of the village lasses joining hands with his as the conrection link;'[১১]

এর অব্যবহিত পরে এক ব্রাহ্মণ, রাজকুমারীর হাত গণনা করে রাজকুমারীর ইতিপূর্বেই বিবাহাদি সম্পন্ন হয়েছে বলে যে ঘোষণা করেছেন বলে গল্পে উল্লিখিত হয়েছে, টডেও তার সমর্থন মেলে। শেষ পর্যন্ত বাপ্পা রাজকুমারীকে গোপনে বিবাহ করার জন্যই নগেন্দ্রনগর ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং এই সময়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছে বালিয় ও দেব নামে দুজন ভীল।

মহর্ষি হারীতের সঙ্গে বাপ্পার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিকে লেখক ঈষৎ পরিবর্তিত করেছেন। গল্পে মহর্ষি হারীতের সঙ্গে তাঁর মহাপ্রস্থানের দিনে বাপ্পার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে কথিত হয়েছে। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায় দীর্ঘদিন হারীতের সঙ্গে বাপ্পার ছিল যোগাযোগ। বাপ্পা প্রত্যহ তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন নানা কারণেই—মহর্ষির পদ প্রক্ষালন, তাঁর পূজার জন্য পুষ্পচয়ন, মহর্ষিকে দুগ্ধ যোগান ইত্যাদির উদ্দেশ্যে। মহর্ষির নিকট থেকে বাপ্পা নানা বিষয়ে শিক্ষাও গ্রহণ করতেন—

'he went daily to visit him, to wash his feet, carry milk

to him, and gather such wild flowers as were acceptable offerings to the deity. In return he received lessons of morality, and was initiated into the mysterious rites of Siva and at length he was invested with the triple cordon of faith by the hands of the sage, who became his spiritual guide, and bestowed on his pupil the title of 'Regent (Dewan) of Eklinga'.[১২]

গল্পে মহর্ষি হারীতের নিকট থেকে বাপ্পার ভবানী প্রদত্ত তূনীর, ধনুক, বর্ম প্রভৃতি লাভের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। টডের রচনাতেও এর সমর্থন মেলে।

অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় মহর্ষি হারীতের সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। কিন্তু 'রাজস্থানে' কেবলমাত্র বর্ণিত হয়েছে—

'the saint was soon lost in the cerulean space' [১৩]

টডের বর্ণনানুযায়ী হারীত ব্যতিরেকে বাপ্পার গোরক্ষনাথ নামক অপর এক সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে এঁর কাছ থেকেই বাপ্পা লাভ করেছিলেন দুই প্রান্ত বিশিষ্ট তরবারি—

'But, as if the brand of Bhavani was insufficient, he met with another hermit in the forest of ige Mount, the famed Goruknath, who presented to him the doubleedged sword which, with the proper incantation could 'sever rocks'[১৪]

এবং আরো বর্ণিত হয়েছে যে এরই সহায়তায় বাপ্পা চিতোরলাভে হয়েছিলেন অধিকারী।

'with this he opened the road to fortune leading to the throne of cheetore'.[১৫]

কিন্তু গল্পে পাহাড় ভেদে সক্ষম একটি খড়গ, মহর্ষি হারীতের নিকট থেকেই বাপ্পা প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। গোরক্ষনাথের প্রসঙ্গ অবনীন্দ্রনাথের রচনায় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

পঞ্চদশবর্ষীয় বালক বাপ্পার চিতোর রানা মানের পক্ষে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একাকী অংশগ্রহণ এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়লাভ বিষয়ে গল্পে যা বর্ণিত হয়েছে, তা টডের বর্ণনানুগ। এমন কি বাপ্পার কারণে চিতোর অধিপতির বিরুদ্ধে অপরাপর রাজপুত সামন্তবর্গের ক্ষুব্ধ হওয়ার বিষয়েও টডের সমর্থন মেলে। টডের বর্ণনানুসারে রাজ্যলিপ্সাই বাপ্পাকে তাঁর আশ্রয়দাতা মাতুল চিতোর রাজকে হত্যার ব্যাপারে করেছিল প্ররোচিত। কিন্তু পঁচাশী বৎসর বয়স্ক বাপ্পার পালক পিতা রাজপুরোহিত প্রদত্ত তাম্রনির্মিত কবচটি বাপ্পার উত্তর জীবনের ট্রাজেডী রচনার কারণ রূপে যা গল্পে বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ের কোন উল্লেখ 'রাজস্থানে' পাওয়া যায় না। ভিখারিণী নবাবজাদী এবং সন্ন্যাসিনী শোলাংকী রাজনন্দিনীর চরিত্রদ্বয়ও অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। 'রাজস্থানে' কেবলমাত্র উল্লিখিত হয়েছে যে, বাপ্পা তাঁর শত্রু কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে হয়েছিলেন আবদ্ধ—

'Bappa, on this occasion is said to have married the daughter of his enemy',[১৬]

বাল্যে ক্রীড়াচ্ছলে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ যে শোলাংকী রাজনন্দিনীর জন্যে বাপ্পার আজীবন ব্যাকুলতা গল্পটির দীর্ঘ অংশ অধিকার করে আছে, তাও গল্পকারের স্বকপোলকল্পিত। চিতোর-রাজ মাতুলকে হত্যার জন্যে উত্তর জীবনে বাপ্পার যে পরিতাপ এবং এই পাপস্খালনের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করার সংকল্প বিষয়ে গল্পটিতে যা উল্লিখিত হয়েছে, 'রাজস্থানে' তারও সমর্থন মেলে না বরং বিপরীতক্রমে 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে যে বাপ্পা রাজা মানের পরিচয় পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে গল্পকার বাপ্পার অকৃতজ্ঞ আচরণের এক যুক্তি সঙ্গত কারণ উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন লক্ষিত হয়।

অবশ্য বাপ্পার মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনার সঙ্গে টডের বর্ণনার ঘনিষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হলে পর তাঁর অন্তিমকার্য প্রসঙ্গে হিন্দু ও পাঠান প্রজাদের মধ্যেকার বিরোধ এবং পরিশেষে তাঁর মৃতদেহের পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে পদ্মফুলের অবস্থান বিষয়ে গল্পে যা বর্ণিত হয়েছে, 'রাজস্থানে'ও তার সমর্থন মেলে—

'The chronicles also record that the subjects of Bappa Quarrelled for the disposal of his remains. The Hindu wished the fire to consume them, the barbarian, to commit them to earth; but on raising the pall while the dispute was raging, innumerable flowers of the lotus were found in the place of the remains of mortality'.[১৭]

গল্পে অবশ্য পদ্মফুলের সঙ্গে গোলাপ ফুলের কথাও বর্ণিত হয়েছে। গল্পটিতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত শোলাংকী রাজকুমারী বাপ্পার মৃতদেহটি হিন্দুকুশ পর্বত-শিখরে চিতায় স্থাপন করেছিলেন। এই বিবরণ কিন্তু 'রাজস্থানে' অনুপস্থিত।

অতএব টডের বর্ণনার সঙ্গে 'বাপ্পাদিত্য' গল্পটির যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনই বৈসাদৃশ্যও বর্তমান। বলা যেতে পারে, গল্পটি লেখকের প্রায় মৌলিক রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

টড তাঁর গ্রন্থে পদ্মিনীর কারণে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করলেও পদ্মিনীর রূপৈশ্বর্য বিষয়ে আলাউদ্দীনের প্রথম অবগতির সূত্র বিষয়ে নীরব থেকেছেন। এই সূত্র আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হতে দেখা গেছে রূপবিলাসী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে।

রূপ ও সৌন্দর্যে ভারত-বিখ্যাত পদ্মিনীর পরিচয় সম্রাটের কাছে উদ্‌ঘাটনের পূর্বে তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছেন লেখক। খাস-মহলের ছাদে গজদন্তনির্মিত খাটিয়ায় উপবিষ্ট সম্রাট বসন্ত পাশীন

চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় পিয়ারী-বেগম সমভিব্যাহারে যখন সরবত পানে রত, সেই সময়ে পিয়ারী-বেগমের নতুন বাঁদীর গীত হিন্দুস্থানের গানে তিনি পদ্মিনীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য বিষয়ে প্রথমে অবহিত হলেন।

সম্রাট কর্তৃক রানা ভীমসিংহকে বন্দী করে তাঁর মুক্তিপণ-স্বরূপ পদ্মিনীকে লাভ করার পরিকল্পনা রচনার সূত্রটিও লেখকের স্বকপোল-কল্পিত। শিকার প্রত্যাগত আলাউদ্দীনের হস্তস্থিত শিকারী বাজকর্তৃক আকাশে উড্ডীয়মান শুক-সারী যুগলের মধ্যে শুক পাখীটি ধৃত হলে বেদনাকাতর সারীর স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের ঘটনা সম্রাটকে অনুপ্রাণিত করেছে ভীমসিংহকে বন্দী করে পদ্মিনীকে করায়ত্ত করতে। এক্ষেত্রে মূল ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক ঘটনার সঙ্গতি রক্ষায় লেখকের সবিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশিত।

৩শিচন্তাগ্রস্ত রানা লক্ষ্মণসিংহকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী উবরদেবীর ছদ্মবেশে পদ্মিনীর নির্দেশ দান—

'রাজা-প্রজা বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে, তবেই কল্যাণ। না হলে, সূর্যবংশের রাজপরিবার আর কখনো চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না।'

—মূল ঘটনার তুলনায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে উপস্থাপিত। এক্ষেত্রে টডের বর্ণনায় দেখা যায় স্বয়ং চিতোরেশ্বরীই রানার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং চিতোর রক্ষার্থে রানার দ্বাদশটি পুত্রকে বিধিমত উপযুক্ত রাজ্যাভিষেকের পর আত্মদানের পরামর্শ দান করেছিলেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে টডের মন্তব্য

'whether we have merely the fiction of the poet, or whether the scene was got up to animate the spirit of resistance, matters but little, it is consistent with the belief of the tribe'.[১৮]

লেখক টডের উপরোক্ত মন্তব্যের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন লক্ষ্য করা যায়। পদ্মিনী চিতোর রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসাবে

চিতোরেশ্বরীর ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়ে রাজ্যের রাজা-প্রজা-বালককে চিতোর রক্ষার্থে আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করেছেন।

সর্বোপরি রানার জ্যেষ্ঠপুত্র অরিসিংহ কর্তৃক অজয়সিংহকে চর্মাবৃত থলি ও তাঁর অন্তিম ইচ্ছা সম্বলিত পত্র প্রদানের বিষয়টিও লেখকের স্বাধীন সংযোজন।

'হাম্বির' গল্পটিতে মুখ্যতঃ মুঞ্জ ডাকাতের অত্যাচার ও হাম্বির কর্তৃক তার হত্যার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

যুবরাজ অরিসিংহের শিকার উপলক্ষে উজলা গ্রামস্থিত চন্দাসো বংশের চৌহান কন্যার পরিচয় লাভ এবং পরে তাকে বিবাহ করার বিষয়টি 'রাজস্থান' অনুসরণেই লেখক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুঞ্জ ডাকাতকে হত্যার বিনিময়ে রাজ্যের অধিকারী হওয়ার যে শর্ত অজয়সিংহ কর্তৃক আরোপিত হয়েছে, তার সমর্থন টডে মেলে না। এমন কি রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে যাতে অরিসিংহের এবং অজয়সিংহের পুত্রদের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য সামন্ত-সর্দার মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোকের নির্বাচিত রাজকুমারকে সিংহাসনের অধিকারী করার বিষয়ে পত্রে প্রকাশিত অরিসিংহের প্রস্তাবটিও লেখকের স্বকল্পিত ব্যাপার।

গল্পে বর্ণিত হয়েছে, 'উজলা গ্রাম থেকে লছমীরাণী হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন।' অর্থাৎ এখানে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিকেই বোঝান হয়েছে। কিন্তু টডে বলা হয়েছে,

'Hamir was summoned and accepted the fued against Moonja,'[১৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুঞ্জ ডাকাতকে হত্যা করার ব্যাপারে সুজনসিং এবং হাম্বিরকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করার ব্যাপারটির সমর্থনও টডে অনুপস্থিত। পরিশেষে মুঞ্জ ডাকাতকে হত্যা করার ব্যাপারে হাম্বির কর্তৃক অবলম্বিত উপায়টি লেখকেরই স্বাধীন সংযোজন। টড হাম্বির কর্তৃক মুঞ্জ ডাকাতের হত্যার বিষয়টি

বর্ণনা করলেও কি উপায়ে তিনি কার্যসিদ্ধি করেছিলেন সে সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অথচ গল্পের উল্লেখযোগ্য স্থান এই বিষয়টির বর্ণনাতেই ব্যয়িত হয়েছে, বলাবাহুল্য তা গল্পের আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণেই এবং এ ব্যাপারে লেখক বাঞ্ছিত সাফল্যেরও অধিকারী হতে সমর্থ হয়েছেন বলা চলে।

'হাম্বিরের রাজ লাভ' শীর্ষক গল্পটিতে লেখক মোটামুটি ভাবে টডের বর্ণনার অনুসরণ করলেও গল্পের শেষাংশটি সম্পূর্ণরূপে লেখকের স্বকপোলকল্পিত। কমলকুমারীর সহায়তায় হাম্বিরের ভবানীর খাঁড়া লাভের দুরূহ প্রয়াসের যে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, সেটি সম্বন্ধে টডের গ্রন্থে কোনরূপ উল্লেখ দেখা যায় না।

হাম্বির কর্তৃক চিতোর অধিকারের ঘটনাটি তাঁর শ্যালক বনবীর দিল্লীর নবাবের গোচরীভূত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে গল্পে উল্লিখিত হলেও 'রাজস্থানে' কিন্তু বর্ণিত হয়েছে,

'Maldeo himself carried the account of his loss to the Ghilji King Mahmood, who had succeeded Alla.'[২০]

শিঙ্গোলীতে হাম্বিরের নিকট পাঠান বাদশাহের শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণ এবং পরিণামে তিনমাস চিতোরে বন্দী জীবনযাপন এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ লক্ষ মোহরের বিনিময়ে মুক্তি লাভের বিবরণ 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত। তবে এক্ষেত্রে লেখক পাঠান বাদশার মুক্তিপণ স্বরূপ কেবলমাত্র পঞ্চাশ লক্ষ মোহরের উল্লেখ করলেও 'রাজস্থানে' সেই সঙ্গে একশতটি হাতী এবং তৎসহ সুইসোপুর (Sooe Sopur), আজমীর, রণথম্বোর, নাগোর প্রভৃতি প্রদানের বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে।

গল্পে মালদেব কর্তৃক হাম্বিরের সঙ্গে তাঁর কন্যা কমলমীরের বিবাহ দানের প্রস্তাব স্বরূপ নারকেল প্রেরণ এবং হাম্বীরের কমলমীরকে পত্নী-রূপে গ্রহণে সম্মতি স্থাপন, অতঃপর পাঁচশত রাজপুত সৈন্য সমভি-ব্যাহারে বিবাহের উদ্দেশ্যে চিতোর গমন এবং সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর পরিবেশে

চিতোরে হাম্বিরের বিবাহদির বিষয়ে বর্ণিত ঘটনারাজি 'রাজস্থানে'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু লেখক কমলমীরের পূর্ব জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছেন লক্ষিত হয়। টড কমলমীরের পূর্ব জীবনের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

'She had been weded to a chief of the Bhatti tribe, shortly afterwards slain, and when she was so young as not to recollect even his appearance.' [২১]

মালদেব কিন্তু হাম্বিরকে না জানিয়েই বিধবা কমলমীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহ বাত্রে হাম্বির নব পরিণীতা স্ত্রীর নিকট থেকে এই সকল বিষয় অবগত হয়ে স্বভবতঃই অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছেন। কিন্তু এইরূপ অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধস্বরূপ কমলমীরই তাঁকে চিতোর আক্রমণের পরামর্শ দান করেছেন। লেখকের এই সকল বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনের কারণ বোধগম্য নয়। বরং এই বিষয়-গুলির উল্লেখে গল্পটির আকর্ষণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষরূপে সহায়কই হত বলা চলে।

'চণ্ড' গল্পটিতে চণ্ডের ছোট ভাই রঘুদেবের মৃত্যুর কথা বর্ণিত হলেও রণমল্ল কর্তৃক প্রেরিত পরিচ্ছদ পরিধানকালে যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, সে বিষয়টি অনুল্লিখিত রয়েছে।

লখারানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,

'বিয়ের দু বছর পরে দু মাসের ছেলে মকুলকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি এক কম্বল এক লোটা নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন।'

কিন্তু টডের গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

'Mokulji was the issue of this union, and had attained the age of five when the Rana resolved to signalize his finale by a raid against the enemies of their faith, and to expel the 'barbarian' from the holy land of Gya.' [২২]

স্বেচ্ছায় নির্বাসিত চণ্ডের নিকট রায় রণমল্লের হাত থেকে উদ্ধার

লাভের জন্য পায়রার মাধ্যমে দাইয়ের এবং রাণীর পত্র প্রেরণের বিষয়টি লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

লেখক বলেছেন, চণ্ড যখন চিতোর ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনশো ভীল তাঁর সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু টড বলেছেন,

'At his departure he was accompanied by two hundred Ahaireas or huntsmen,' ২৩

রণমল্লের মৃত্যুর বিবরণেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। টড বলেছেন,

'With no arms but a brass vessel of ablution, he levelled to the earth several of his assailants, when a ball from a matchlock extended him on the floor of the palace.' ২৪

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় দেখা যায়, দাই ছুঁচো বাজি দিয়ে রণমল্লের ঘরটি পূর্ব থেকেই পূর্ণ করে রেখেছিল। ঘরের কোণে রাখা বারুদে আগুন জ্বলে ওঠে এবং এই আগুনেই রণমল্লের মৃত্যু হয়।

মূলতঃ কিশোরদের জন্য রচিত বলে লেখক একদিকে যেমন তাদের মনোরঞ্জনার্থে কয়েকটি নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন—যেমন মুকুলের সঙ্গে চণ্ডের খেলা, ঘোড়ায় চড়া, শিকার, দুই দাদার উদ্দেশে বালক রানার পত্র লিখন, উপবাসী রাঁধুনী ঠাকুরের খিদের জ্বালা, মুঁজপাতার রঙে বৃদ্ধ মারোয়াড়ী সেপাইদের দাড়ি-গোঁফ রঞ্জিত হলে এইজন্য তাদের ভীত হওয়া ইত্যাদি। অপরপক্ষে দাইয়ের প্রতি বৃদ্ধ রাজা রায় রণমল্লের আসক্তি হওয়ার প্রসঙ্গটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

চণ্ড কর্তৃক হরোয়া শংকলের তপোবনে আশ্রয় গ্রহণের প্রসঙ্গটিও লেখকের স্বাধীন সংযোজন।

'রানা কুম্ভ' গল্পটির দুটি অংশ—পিতৃহন্তা দুই খুল্লতাত চাচা এবং মৈরের রানা কুম্ভ কর্তৃক হত্যাসাধন এবং কুম্ভের পত্নী মীরাবাঈয়ের কৃষ্ণপ্রীতি। লেখক গল্পটিতে রানা মুকুলের পরিহাস প্রিয়তাকেই শেষ

পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ রূপে চিহ্নিত করেছেন। রঙ্গপ্রিয় রানা তাঁর দুই খুল্লতাত চাচা আর মৈরের প্রত্যেককে সাতশত সিপাইয়ের সর্দার পদে নিযুক্ত করে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। এবং এই কারণে খুল্লতাত-দ্বয় রানার ওপর যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হলেন এবং নিজেদের ক্ষোভের কথা প্রকাশও করলেন। তারপর একদিন একটি অপরিচিত গাছের নাম জানতে চাইলেন রানা তাঁর খুল্লতাতদ্বয়ের কাছে এতে ফল হল বিপরীত। কারণ খুল্লতাতদ্বয়ের মা ছিলেন একজন কাঠুরিয়া কন্যা। সুতরাং চাচা এবং মৈর ব্যাপারটিকে গুরুতর রূপেই গ্রহণ করলেন এবং অসম্মানিত বোধ করে সেই মুহূর্তেই তাঁরা মুকুলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অতঃপর সুযোগমত তাঁরা একদিন রানা মুকুলকে হত্যা করলেন। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিলেন কুম্ভ খুল্লতাতদ্বয়কে হত্যা করে।

'রাজস্থানে' উপরোক্ত ঘটনাটি স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে, লেখক কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে কাহিনীটি প্রকাশ করেছেন। অবশ্য মূল ঘটনাটিকে অবিকৃত রেখেই।

গল্পে চাচা ও মৈরকে লেখক আফিংখোর, ভোজন বিলাসী ও অলস প্রকৃতির রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু টড এ সকল বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নি। বরং লেখক যেক্ষেত্রে মুকুলের রঙ্গ প্রিয়তাকেই তাঁর খুল্লতাতদ্বয়ের বিরাগভাজন হওয়ার কারণ রূপে অভিহিত করেছেন, সেক্ষেত্রে টডের বর্ণনায় দেখা যায় চাচা ও মৈরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কয়েকজন রাজপুত সর্দার তাঁদের অপদস্থ করার জন্য ছিলেন সুযোগের প্রতীক্ষায় এবং সেই সুযোগ উপস্থিত হল রানা কর্তৃক খুল্লতাতদ্বয়কে একটি অপরিচিত বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে—

'Some chiefs at enmity with them, conceiving that they had overstepped their Privileges, wished to see them humiliated.' ৫৫

অতঃপর চাচা এবং মৈর গিয়ে আশ্রয় নিলেন পায়ীগ্রামস্থিত রাতকোটের কেল্লায়। এদিকে পায়ীগ্রামের দফাদারের সুন্দরী মেয়েটি গেল হারিয়ে। এ ব্যাপারে সকলে চাচা এবং মৈরকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করলে। তারাই মেয়েটিকে চুরি করেছে। কন্যাহারা দফাদার শরণাপন্ন হল রানা কুম্ভের। এরপর রানা কুম্ভ দফাদারের সহায়তায় রাতকোটের কেল্লায় অবস্থানকারী তার খুল্লতাতদ্বয়কে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

গল্পে দফাদারের মেয়েটিকে চাচা ও মৈর যে চুরি করেছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। বরং তাঁরা একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়ে তাকেই গভীর স্নেহে লালন-পালনে নিযুক্ত ছিলেন বলে বলা হয়েছে। অথচ টডের বর্ণনায় দেখা যায় তাঁরাই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন—

'It would appear that their lives were dissolute, for they had carried off the virgin daughter of a chohan, which led to their eventual detection and punishment.' [২৬]

গল্পে মেয়েটির পিতাকে 'পায়ীগ্রামের দফাদার' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু টড এক্ষেত্রে 'সুজা' নামক এক চোহানের কন্যা বলে বর্ণনা করেছেন।

লেখকের বর্ণনানুযায়ী রাতকোটের দুর্গে চাচা ও মৈরের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল 'হিঙ্গুলিয়া' নামক একটি শিকারী কুকুর এবং এই কুকুরটিকে হত্যার পর চাচা ও মৈরের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে। অথচ টডের গ্রন্থে 'হিঙ্গুলিয়া' নামক কুকুরের উল্লেখ অনুপস্থিত। তৎপরিবর্তে একটি বাঘিনীকে হত্যা করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

টডের বর্ণনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের বর্ণিত কাহিনীর অপরাপর কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যের বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পে বর্ণিত হয়েছে রানা, চাচা ও মৈর প্রত্যেকের উপরেই মাদেরিয়ার বিদ্রোহী ভীলদের দমন করার অভিপ্রায়ে সাতশত করে সৈন্যের দায়িত্ব

করেছিলেন স্তম্ভ। কিন্তু টডের বর্ণনায় উভয়কে একসঙ্গে সাতশত সৈন্যের দায়িত্বে নিযুক্ত করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে—

'brothers had the charge of seven hundred horse in the train of Rana Mokul at Madaria.' [২৭]

খুল্লতাতদ্বয়ের একজনকে লেখক 'মৈর' বলে বর্ণনা করলেও টড তাঁকে 'মীরা' বা 'মীর' বলে অভিহিত করেছেন।

রানা কুম্ভ বিবাহ করেছিলেন মীরাবাঈকে। এই মীরাবাঈয়ের রূপ ও গুণ ছিল সীমাহীন। বিশেষতঃ তাঁর রচিত গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

'Meera Bai was the most celebrated Princess of her time for beauty and romantic Piety. Her compositions were numerous….' [২৮]

'রাজস্থানে' মীরাবাঈয়ের প্রসঙ্গ নিতান্ত সীমিত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ভক্তিমতী মীরাবাঈয়ের প্রসঙ্গটিকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে ব্যক্ত করেছেন। এমন কি রানার মীরাকে ত্যাগ করার বিষয়টিও 'রাজস্থানে' অনুপস্থিত। তবে ঝালোয়ার অধিপতির কন্যা মন্দুর রাজকুমারের বাগ্‌দত্তা ঝলকুমারীকে রানা কর্তৃক অপহরণের বিষয়টি টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত—

'He carried off the daughter of the chief of Jhalwar, who had been betrothed to the Prince of Mundore' [২৯]

তবে 'ঝালকুমারী' নামটি লেখক প্রদত্ত।

'রাজকাহিনী'র শেষ গল্পটি 'সংগ্রামসিংহ'। গল্পটি আনুপূর্বিক 'রাজস্থান' অনুসরণেই রচিত। সঙ্গের নামানুযায়ী গল্পটির নামকরণ 'সংগ্রামসিংহ' হলেও, মূলতঃ গল্পটিতে পৃথ্বীরাজের কাহিনীই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

রানা কুম্ভের ঝুনঝুনের লড়াইয়ের অব্যবহিত পর থেকে হাতের তলোয়ার তিনবার মাথার উপর ঘুরিয়ে কিছু অজ্ঞাত মন্ত্রপাঠের পর

সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রায়মল কৌতূহলবশতঃ ঐ বিষয়ে রানাকে প্রশ্ন করলে পরিণামে ক্রুদ্ধ রানা কর্তৃক তার নির্বাসিত হওয়ার বিষয়টি 'রাজস্থান' অনুসরণেই বর্ণিত হয়েছে—

'He had observed that his father, eversince the victory over the king at Jhoonjoonnu, before he took a seat thrice waved his sword in circles over his head, pronouncing at the same time some incantation. Inquiry into the meaning of this was the cause of his banishment.'[৩০]

'ঘাতীরাও' নামক কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক বিষপ্রয়োগে রানার মৃত্যুবরণের বিষয়ও টড কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বিষপ্রয়োগে পিতাকে হত্যার পর বড় বড় সর্দারকে জমিদারীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে তাদের স্বপক্ষে আনয়নের প্রয়াস, দিল্লীর নবাবের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাবদান এবং সর্বোপরি পথিমধ্যে তার বজ্রপাতে মৃত্যুবরণের ঘটনা 'রাজস্থান' অনুসরণেই বর্ণিত—

'He humbled himself before the king of Delhi, offering him a Daughter in marriag to obtain his sanction to his authority ; "but heaven manifested its vengeance to prevent this additional inquiry, and preserve the house of Bappa Rawul from dishonour." He had scarcely quitted the divan (Dewan—Khneth), on taking leave of the king, when a flash of lighting struck the 'Hatiaro' to the earth, whence he never arose.'[৩১]

ঘাতীরাওয়ের শোচনীয় মৃত্যুবরণের পর 'ইদর' রাজ্য থেকে সন্ধান করে রাজপুত সর্দারেরা রায়মলকেই শেষে চিতোরের সিংহাসনে এনে অধিষ্ঠিত করলেন। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনানুযায়ী ঘাতীরাওয়ের মৃত্যুর সুযোগে রায়মল চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁকে কোনপ্রকার বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায় যে, নিজের শক্তিমত্তার দ্বারাই তিনি সিংহাসন অধিকারে সমর্থ হয়েছিলেন—

'Raemul succeeded in S. 1530 (A. D. 1474) by his own Valour to the seat of Koombho. He had fought and defeated the usurper (ঘাতীরাও), who on this occasion fled to the king of Delhi.' ৩২

অবনীন্দ্রনাথ নিছক হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন যে দিল্লীর নবাব ঘাতীরাওয়ের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে এসে রায়মলের সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পুনরায় দিল্লী প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু টডের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় দিল্লীর নবাব পিতৃহন্তা ঘাতীরাওয়ের দুইটি পুত্র সমভিব্যাহারে মেবার আক্রমণ করেছিলেন এবং প্রচণ্ড সংগ্রামে পরাভূত হয়ে চিতোর ত্যাগে হয়েছিলেন বাধ্য। এই প্রসঙ্গে রায়মলের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বিষয়েও উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে রায়মলের পক্ষে আটান্ন হাজার অশ্বারোহী এবং এগারো হাজার পদাতিক সৈন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা অবিকৃতভাবে বর্ণনা করলেও অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা আটান্ন হাজারের পরিবর্তে বাহান্ন হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। এ পর্যন্ত গল্পের প্রথমার্ধ। এর পরই গল্পের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু।

রায়মলের তিনটি পুত্র—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ এবং জয়মল; তিন রাজপুত্র এবং তাদের খুল্লতাত সুরজমল একদিন চিতোরের ভাবী রানার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী নাহরা মুংরায় (**Nahra Mungr**) ব্যাঘ্রমেরু (**Tiger Mount**) নামক পাহাড়ে অবস্থানকারী চারণী মন্দিরের পূজারিণী 'সিদ্ধিকারী'র নিকট উপস্থিত হলেন নিজ নিজ ভবিষ্যৎ গণনা করাতে। অতঃপর সিদ্ধিকারীর ভবিষ্যৎবাণীকে কেন্দ্র করে রাজপুত্রগণের মধ্যে উপস্থিত হয় তীব্র সংঘর্ষ। গুরুতররূপে আহত সঙ্গের রাজভক্ত 'বিদ্যা'র গৃহে আশ্রয় গ্রহণ এবং সঙ্গের জীবন রক্ষার্থে জয়মলের হাতে বিদ্যার প্রাণ-

বিসর্জনের কাহিনী সকলই টডের বর্ণনানুগ। অবশ্য এক্ষেত্রে রাজপুত্রগণের ভবিষ্যৎ গণন। উপলক্ষে চারণী মন্দিরের সিদ্ধিকারী কথিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কাহিনীটি লেখকের স্বকৃত সংযোজন।

রানা কর্তৃক পৃথ্বীরাজের বিতাড়িত হওয়া, উঝার পরামর্শে মীনরায়ের শাসনাধীন গদাওয়ার অধিকার, বৃদ্ধ রানার বিদ্রোহী সুরজমল ও সারংদেবকে দমন, টোডার রাজা রায় শূরতানসিং-এর কন্যা তারাবাইয়ের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং পরিশেষে শিরোহীতে কনিষ্ঠা ভগিনীর উপর অকথ্য নির্যাতন করায় ভগ্নীপতিকে শাসন করার পরিণামে ভগ্নীপতির চক্রান্তে বিষপানে পৃথ্বীরাজের মৃত্যুবরণের বিবরণ সকলই 'রাজস্থান' অনুসরণে উপস্থাপিত।

তারাবাইয়ের অনুরাগী জয়মলের মৃত্যুবরণের বিষয়টি কিন্তু কিছু পরিবর্তিত রূপে উপস্থাপিত। লেখকের বর্ণনানুযায়ী বিতাড়িত টোডা অধিপতির কন্যা তারাবাইয়ের ছুরিকাঘাতেই নির্লজ্জ কাপুরুষ জয়মলকে করতে হয়েছিল মৃত্যুবরণ। কিন্তু টডের বর্ণনায় দেখা যায়—

'Jeimal willing to anticipate the reward (তারাবাই), and rudely attempting access to the fair, was slain by the indignant father.' ৩৩

রাজপুত বীরাঙ্গনা তারাবাইয়ের ব্যক্তিত্বকে অধিকতর পরিস্ফুট করার অভিপ্রায়েই লেখক এবংবিধ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। তবে জয়মলের পূর্বোল্লিখিত পরিণামের পর রানার আচরণ টডের বর্ণনানুসরণেই চিত্রিত হয়েছে। তিনি টোডা অধিপতির হাতে পুত্রের মৃত্যু বরণকে তার কৃতকর্মের সঙ্গত পরিণাম রূপেই কেবলমাত্র স্বীকার করেন নি, সেই সঙ্গে শূরতানের আচরণকে সমর্থন জানাতে গিয়ে তাঁকে 'বেদনোর' রাজ্যটিও দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে টডের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

'The Rana, when incited to revenge, rsplied with a

nagnanimity which deserves to be recorded, that be who had thus dared to insult the honour at a father, and that father indistress, richly merited his 'sate' and in proof of his disavowal of such a son he Conferred on the Solanki the district of Bednore.' ৩৪

পাদটীকা

১. স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য ; ড. পশুপতি শাসমল ; পৃঃ ২৭৩

২. A few hours only intervened between his (Jey Sing) extrance into the world and that of another son called Bheem ; Vol I, Chap XIV ; Page 316

৩. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chop XIV ; Page 316

৪. Ibid ; Vol I ; Chap XIX ; Page 316

৫. Ibid ; Vol I ; Chap VI ; Page 223

৬. স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য ; ড. পশুপতি শাসমল ; পৃঃ ৺৮১

৭. শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; বাংলার লেখক ; প্রমথনাথ বিশী ; পৃঃ ৯৯

৮. Annals and Antiquities of Rajasthan ; Vol I ; Chap I ; Page 185

৯. Ibid ; Vol I ; Chap I ; Page 185

১০. Ibid ; Vol I ; Chap I ; Page 186

১১. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 187-188

১২. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 189

১৩. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 190

১৪. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 190

১৫. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 190

১৬. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 191

১৭. Ibid ; Vol I ; Chap II ; Page 191-192

১৮. Ibid ; Vol I ; Chap VI ; Page 221

১৯. Ibid ; Vol I ; Chap VI ; Page 223

২০. Ibid ; Vol I ; Chap VI ; Page 226

২১. Ibid ; Vol I ; Chap VI ; Page 225

২২. Ibid ; Vol I , Chap VII ; Page 229

২৩. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 231

২৪. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 232

২৫. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 235

২৬. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 235

২৭. Ibid ; Vol I ; Chap VII ; Page 235

২৮. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 239

২৯. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 239

৩০. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 240

৩১. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 240

৩২. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 240

৩৩. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 243

৩৪. Ibid ; Vol I ; Chap VIII ; Page 243

সপ্তম অধ্যায়

টডের 'রাজস্থান' ও ইতিহাসমূলক রচনা

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে বাঙ্গালায় যে কেবল নাটক, গল্প, কাব্য ইত্যাদিই রচিত হয়েছিল তা নয়, বেশ কিছু লেখক 'রাজস্থানে'র বিষয়বস্তু অবলম্বনে কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও জীবনী গ্রন্থাদি রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'রাজস্থানে'র বিষয় বাঙ্গালী চেতনাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন বিভাগই এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। স্বদেশপ্রেম, ইতিহাস চেতনা ও রোমান্টিকতার প্রতি আকর্ষণ আমাদের অনেক কবি-নাট্যকার-ছোট গল্পকারের মত বহু প্রাবন্ধিক ও জীবনীকারকেও উদ্দীপিত করেছিল 'রাজস্থান' বিষয়-নির্ভর গ্রন্থাদি রচনায়।

এক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখযোগ্য—ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখতে 'রাজস্থান'কে আকর গ্রন্থরূপে গ্রহণ করলেও আমরা সেইসব ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচয়িতাদের দোষারোপ করতে পারিনা। কারণ যে সময়ে 'রাজস্থান' গ্রন্থটি আকর গ্রন্থরূপে গৃহীত হ' ছিল, তখন 'রাজস্থানে'র ইতিহাস ছিল প্রায় অজ্ঞাত। বর্তমানে 'রাজস্থান' গ্রন্থের অনৈতিহাসিকতা নানা ক্ষেত্রেই প্রমাণিত, তবু সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির মর্যাদা ও গুরুত্ব যে অনেকখানিই ছিল, তা অবশ্য স্বীকার্য।

'আর্য্য-কীর্তি' (প্রথম খণ্ড) রজনীকান্ত গুপ্ত রচিত এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। লেখক মুখ্যতঃ বৈদেশিক সভ্যতায় প্রভাবিত এদেশের মানুষকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে রাজপুতানার কয়েকজন বীরপুরুষের মহান আত্মত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয়বাহী কাহিনী

'আর্য্য-কীর্ত্তি'র প্রথম খণ্ড থেকে পঞ্চম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেছেন। প্রথম খণ্ডে রানা কুম্ভের বদান্যতা, রানা রায়মল্লের মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতা, ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও তাঁর জননী এবং পত্নীর অতুলনীয় বীরত্ব, ধাত্রী পান্নার অদ্বিতীয় কর্তব্য পরায়ণতা, প্রতাপের অতুলনীয় বীরত্ব ও লোকোত্তর দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ক কাহিনী সংকলিত হয়েছে। লেখক মুখ্যতঃ টডের 'রাজস্থান' অনুসরণেই গল্পগুলি রচনা করেছেন।

দেশপ্রেমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার অভিপ্রায় রচনার মাঝে মাঝে বিশেষ করে বাঙ্গালীর উদ্দেশে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক উক্তি উক্ত হয়েছে। পান্নার অতুলনীয় কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন :

'আজএই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সীতেজস্বিতার গৌরব বুঝিবে কে? বাঙ্গালী! তুমি ভীরু। প্রকৃত তেজস্বিতা আজও তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতার মহান্ ভাব বুঝিতে পার নাই।' (পৃঃ ১৭)

রজনীকান্ত গুপ্ত রচিত 'বীরমহিমা' (১২৯২) দু'টি ভাগে বিভক্ত— যুদ্ধবীর চরিত এবং নারী চরিত। 'যুদ্ধবীর চরিতে' ভারতের কয়েকজন প্রধান বীরপুরুষ এবং 'নারী চরিতে' কয়েকজন বীর রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'যুদ্ধবীর চরিতে'র অন্তর্গত 'প্রতাপসিংহ' এবং 'নারী চরিতে'র অন্তর্গত মীরাবাঈ ও সংযুক্তা মূলতঃ টডের 'রাজস্থানে' প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী রচিত।

'আর্য্য-কীর্ত্তি' ও 'বীরমহিমা' গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক সময় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত কিছু কিছু কাহিনী যেমন—সংযুক্তা, রাজসিংহের রাজধর্ম, বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব, বীরাঙ্গনার বীরত্ব মহিমা, রমণীর শৌর্য, দেবীরের যুদ্ধ, অসাধারণ সাহস ইত্যাদি 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত।

মনোমোহন রায় রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (১ম খণ্ড) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে লেখক প্রতাপসিংহের জীবনী

ছাত্রদের উপযোগী করে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক বলেছেন :

'স্বাধীনতার পবিত্রপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া—স্বদেশ হিতৈষণার জ্বলন্ত উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া, হিন্দু আর্য্যগণ জাতীয় গৌরব সংরক্ষনার্থ যেরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর অতি অল্প জাতিই সেরূপ বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ প্রেমের উদাহরণ দেখাইতে পারিয়াছে। আধুনিক সময়ে তাঁহাদের অধঃপতিত বংশধরগণ এই নশ্বর জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, জগতে তাহাও অতুলনীয়। উল্লিখিত বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনার্থ আমরা সূর্য্যবংশোদ্ভব একটি নরপতির জীবন কাহিনী পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' (পৃঃ ১-২)

এই নরপতি আর কেউ নন, প্রতাপ সিংহ।

ছাত্রদের জন্য গ্রন্থটি রচিত বলে প্রায় প্রতিটি দুরূহ শব্দের অর্থ পাদটীকায় সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত। গ্রন্থটি পাঠ করে রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছিলেন :

'……বীরবর প্রতাপসিংহের জীবনচরিত সুপ্রণালীক্রমে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার লিপিপটু ও গবেষণাকুশল। গ্রন্থের ভাষায় আবেগ ও উচ্ছ্বাস আছে।'

'কীর্ত্তিমন্দির বা রাজপুত-বীর-কীর্ত্তি' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক রচিত। গ্রন্থটি আসলে বাপ্পারাউল থেকে নরসিংহ পর্যন্ত মেবারের রানাদের জীবনী সঙ্কলন।

লেখক নিজেই গ্রন্থের মুখবন্ধে স্বীকার করেছেন, 'টডের গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া এই ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছি'

অবশ্য লেখক অনুবাদকের ন্যায় টডের গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদে প্রবৃত্ত হন নি। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য,

'হিন্দু-যবন বিদ্বেষে ভারতের কি দুর্দশা ঘটিয়াছে এবং ইহা চিরস্থায়ী হইলে এই দুর্দশা অনন্তকাল স্থায়ী হইবে, ইহা প্রতিপন্ন করাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।'

'রাজস্থানে' বর্ণিত ঘটনারাজি অবিকৃত রেখে রচনার নানা স্থানেই

লেখককে উচ্ছ্বাসরাজ্যে বিচরণ করতে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত হলদিঘাটের মহাসমর বর্ণনার অংশ বিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে—

"পাঠক। চল একবার কল্পনাবলে সেই বীরভূমি রাজস্থান—সেই পুণ্য পুঞ্জ মহাসাগর রাজ পুতানা সেই অগণ্য-কীর্ত্তি মহাক্ষেত্র পবিত্র ক্ষাত্রভূমি পর্যটন করিয়া আসি। চল! একবার সেই পবিত্র তীর্থস্থল হলদিঘাটে—সেই ভারতীয় থার্ম্মোপলিতে—রাজ সন্ন্যাসী ক্ষত্রিয়কুল গৌরব মহাপ্রাণ রানা প্রতাপ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ দ্বাবিংশ সহস্র মাত্র রাজপুত সৈন্য লইয়া বীরচূড়ামণি ক্ষত্রকুলাঙ্গার মানসিংহ কর্তৃক পরিরক্ষিত আকবর তনয় সেলিম্ ও তদীয় অগণ্য সৈন্য সাগরের সম্মুখীন হইয়া কেমনে বীরত্বের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আসি; চল পাঠক! কল্পনাদেবীর সাহায্যে সেই মহাদিনে,—যে দিনে চতুর্দ্দিশ সহস্র রাজপুত বীর স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অপূর্ব আত্মোৎসর্গের-জলন্ত দৃষ্টান্তে অনন্তকালের জন্য হিন্দু জাতিকে ইহ জীবনের কর্তব্য শিখাইবার জন্য সমরে অদ্ভুত শৌর্য প্রদর্শন-পূর্বক একে একে নিজ নিজ রুধিরে জন্মভূমিকে উক্ষিত করিতেছেন—"

সতীশচন্দ্র মিত্র রচিত 'প্রতাপসিংহ' গ্রন্থটি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থটি মহারাণা প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। লেখক মন্তব্য করেছেন:

'প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয়-উপন্যাস, ইতিহাস নহে, তাঁহার ঐতিহাসিকতা রক্ষাই বর্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য। প্রতাপ সিংহ প্রবল শত্রু মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়া যোদ্ধধর্মের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন। কিন্তু যোদ্ধত্ব ব্যতীত তিনি অন্যান্য গুণেও সমলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা ও সত্য পালন তাঁহার লোকোত্তর মহত্ত্ব অসাধারণ স্বদেশভক্তি ও দেবদুর্লভ আত্মোৎসর্গ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আর্য্যবীর, আর্য্য নৃপতি ও আর্যযোগীর আদর্শ। প্রতাপ সিংহকে ভারত-প্রতিভার শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।'

গ্রন্থে উপাদানের সূত্র সম্বন্ধে লেখক বলেছেন:

'মহাত্মা কর্ণেল জেম্‌স টড কৃত 'রাজস্থান' নামক ভুবন বিখ্যাত

গ্রন্থ হইতেই বর্তমান পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে।···মহাত্মা টড প্রতাপের অনেক সমসাময়িক ইতিহাস দেখিয়া এবং রাজপুতের গৃহে গৃহে সংগৃহীত পুঁথিপত্র ও রাজদপ্তরের দলিলাদি অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন; সুতরাং আমি প্রধানতঃ উক্ত গ্রন্থেরই আশ্রয় লইয়াছি।'

অবশ্য টডের রচনার ত্রুটি সম্পর্কেও যে লেখক অবহিত ছিলেন, তা তাঁরই উক্তি থেকে জানা যায়। লেখক বলেছেন:

'অবশ্য টড সাহেব যে অভ্রান্ত, তাহা বলিতেছি না; বরং তাহার গ্রন্থে, স্থানে স্থানে যে ভ্রম আছে, তাহা সত্য। সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে ঐ সকল ভ্রমগুলি লোক-লোচনের পথবর্তী হইবে। কোন কোন স্থানে তাহার আয়োজনও চলিতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে।'

তবু টডের গ্রন্থের যে এক অপরিসীম মূল্য আছে, তা অনস্বীকার্য। লেখকের ভাষায়, 'যে দেশে ইতিহাসের চর্চা ছিল না, তথ্যসংগ্রহের কৌতূহল ছিল না, সে দেশে প্রাচীন কথা ও উপকথার উপর অনেক-স্থলে নির্ভর করিতে হয়। এ অবস্থায় ভ্রমশূন্য পুস্তক প্রণয়ন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। মহামতি টড্ সৈন্য পরিচালনা ও রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও ত্রিশ বৎসরের ভীষণ পরিশ্রমে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসীর অমূল্য সম্পত্তি; ভারত সন্তান মাত্রেই এজন্য চিরদিন তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিবেন।······বর্তমান যুগে মহাত্মা টড্ই রাজপুতানার জেনোফন বা থুকিদিদিস্।······বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালা ভাষা মহাত্মা টডের নিকট আরও ঋণী। বাঙ্গালীর যাহা সম্পত্তি, বর্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের যাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঙ্গালাদেশের সেই সাহিত্য ও ইতিহাসের বোধহয় এক-চতুর্থাংশ পুস্তকের অনেক উপকরণই মহাত্মা টডের গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বৈদেশিকের লিখিত কোন পুস্তক কোন ভাষার উপর এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহস্থল।'

লেখক 'রাজস্থান' ছাড়াও আবুল ফজলের আকবর নামা

(আইন-ই-আকবরী), আসাদ বেগ কৃত হালাত, নিজামউদ্দীন আহম্মদ কৃত তবকাত-ই-আকবরী, বদাউনীকৃত মুন্তাখাব্-ত-ত্তোয়ারিকী ও ফেরিস্তাকৃত ইতিহাসের অনুবাদ পুস্তকসকল এবং এলফিনষ্টোন, ইলিয়ট প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাদি থেকেও সাহায্য নিয়েছেন।

গ্রন্থটি ষোড়শ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। লেখক ছাত্রদের জন্য গ্রন্থটি রচনা করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের ছাত্রদের প্রতাপের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে এবং স্বদেশ প্রেমে দীক্ষিত করার অভিপ্রায়েই গ্রন্থটি রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন লেখক। ষোড়শ পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন :

'প্রতাপের চরিত্রের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব—তাঁহার স্বদেশ ভক্তি, তাঁহার মাতৃপূজা। প্রকৃতই তিনি জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতি কথায় এবং প্রতি কার্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইত। জননীর দেহত্যাগে সন্তানের শোকোচ্ছ্বাস সকলেই দেখিয়াছে, অনেকেই অনুভব করিয়াছি। কিন্তু চিতোর ধ্বংসের জন্য প্রতাপের অন্তঃকরণে যে দারুণ শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, আমরণ জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনায়ও উপলব্ধি করিতে পারি না। স্বদেশকে প্রকৃতই কিরূপে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতে হয়, দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে হয়, লোকাচার, ধর্মাচার সমস্তই কিরূপে মাতৃপূজায় বিলীন করিতে হয়, প্রতাপের জীবনে তাহা সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতাপের ইতিহাস অদ্যোপান্ত মাতৃ-পূজার ইতিহাস—অসাধারণ আত্মোৎসর্গের জলন্ত ইতিহাস। স্বদেশভক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে প্রতাপসিংহ অগ্রগণ্য।'

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত রচিত 'রাজপুত-কাহিনী' ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থটি ইতিহাস মূলক কয়েকটি রচনার সংকলন। আলোচ্য গ্রন্থে বাপ্পারাও, সমরসিংহ, কর্মদেবী, রানা লক্ষ্মণসিংহ ভীমসিংহ, পদ্মিনী, হামির, রানা লক্ষ—চণ্ড, মুকুল, রানা কুম্ভ ও রায়মল্ল, রানা সঙ্গ, রানা রত্ন ও বিক্রমজিৎ, রানা উদয়, রানা প্রতাপ, রানা অমর, রাজসিংহ এবং রানা ভীমসিংহ-কৃষ্ণকুমারীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রথিত কাহিনীগুলি 'রাজস্থান' অবলম্বনেই রচিত।

লেখক যে টডের অনুসরণ করেছেন তা গ্রন্থশেষে লেখকের উক্তিতেই প্রমাণিত।

পৃথিবীর ইতিহাস—চিত্রে ও গল্পে পর্যায়ে 'রাজস্থান' গ্রন্থটি বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। টডের গ্রন্থে বর্ণিত 'রাজস্থানে'র বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিকে সংক্ষেপে ছেলেদের উপযোগী করে সংকলন করা হয়েছে। গোহের জন্মবৃত্তান্ত, বাপ্পার বিবরণ, পৃথ্বীরাজ—সংযুক্তার কাহিনী, সমর্ষি পত্নী কর্মদেবী, পদ্মিনী, হামির, চণ্ড, রানাকুম্ভ, রানাসঙ্গ, রানাপ্রতাপ প্রমুখাদির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'পদ্মিনী' গ্রন্থটি ১৩৩২ সালে প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে লেখক পদ্মিনীর অলোক সামান্যা রূপে আকৃষ্ট আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ থেকে শুরু করে কঠিন জহরব্রতে পদ্মিনীর আত্মবিসর্জনের মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। পদ্মিনীর উপাখ্যান যে লেখক টডের গ্রন্থ থেকেই গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

'মেবার কাহিনী' গ্রন্থটি চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ রচিত এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত গ্রন্থটি রাজপুতানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গোহের জন্ম বিবরণ, বাপ্পারাও, রাজর্ষি সমরসিংহ—দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের বিরোধ, রানা লক্ষ্মণসিংহ, পদ্মিনীর উপাখ্যান—আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর আক্রমণ, আলাউদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা, পদ্মিনী কর্তৃক ভীমসিংহকে উদ্ধার, হামির কর্তৃক চিতোর উদ্ধার, রানা কুম্ভের কাছে মালবরাজের পরাজয়বরণ, পুত্রহস্তে কুম্ভের গুপ্তহত্যা, রায়মল্লের সিংহাসন আরোহণ, বিষপ্রয়োগে পৃথ্বীরাজের মৃত্যুবরণ, রানা সংগ্রাম সিংহের সিংহাসনারোহণ, রানা, রত্নসিংহ—বিক্রমজিতের সিংহাসনারোহণ, বনবীর কর্তৃক উদয়সিংহকে হত্যার চেষ্টা, পান্নার অপূর্ব স্বার্থত্যাগ,

পুত্র-জয়মল্লের বীরত্ব, প্রতাপের রাজ্যলাভ, চিতোরোদ্ধারে তাঁর কঠোর প্রতিজ্ঞা, হলদিঘাটের যুদ্ধ, অমরসিংহের সিংহাসনারোহণ, আওরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজসিংহের বিবাদ, হামির, কৃষ্ণকুমারীর বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল ঘটনা ও বিবরণই স্বল্প পরিসরে টডের গ্রন্থানুসরণে প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ফণীভূষণ গুপ্তের অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

টডের 'রাজস্থানে'র বঙ্গানুবাদ

টডের 'রাজস্থান'-কে অবলম্বন করে বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্বাধিক রচিত হয়েছে নাটক। নাটকের পরেই স্থান উপন্যাসের। 'রাজস্থান' অবলম্বনে কিছু কিছু ছোট গল্প, কাব্য এবং প্রবন্ধও রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে একাধিক লেখককে 'রাজস্থানে'র ন্যায় সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদেও প্রয়াসী হতে দেখা গেছে। এই অনুবাদের কারণ—উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙ্গালী হয়ে উঠল ইতিহাস সচেতন। জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে এই ইতিহাস সচেতনতা আত্মপ্রকাশের পথ সন্ধানে রত হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তখনও আমাদের নিজস্ব কোন ইতিহাস গড়ে ওঠেনি। তাই টডের গ্রন্থ অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন একাধিক লেখক। আমরা পূর্বেই দেখেছি দেশের অতীত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী ও চরিত্রকে পরাধীন দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করে দেশবাসীর হৃদয়ে স্বজাত্য তথা জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত করার মহান উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ লেখক টডের গ্রন্থ থেকে বিষয় সংগ্রহ করে নিয়ে রচনা করেছেন নাটক, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই যেহেতু ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাই দেশবাসীকে আমাদের দেশের অতীত উজ্জ্বলময় কাহিনী ও চরিত্রের বিবরণে পূর্ণ টডের 'রাজস্থানে'র সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যেই একাধিক লেখক এই গ্রন্থ অনুবাদের ন্যায় দুরূহ কর্মে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ব্রতী হয়েছিলেন

১২৮০ সালে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার টডের 'রাজস্থানে'র অনুবাদে উদ্যোগী হন। তাঁর এই প্রয়াস সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য:

'সাধনার অত্যাজ্য ফলে রচনাকার্যে তাঁহার যে নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনিই এই মহাদীক্ষার যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই।'

অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ 'রাজস্থানের ইতিবৃত্তে' অনুবাদক হিসাবে তাঁর নাম প্রকাশ করেন নি। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ সরকারের মতে, 'ইহা কর্ণেল টড কৃত রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।'

সুরেন্দ্রনাথ 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' মোট পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশ করেন (১৮৭২-৭৩)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টডের 'রাজস্থানে'র অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ 'পবিত্র রাজস্থান' নামে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁর অনুবাদ কর্মের অন্যতম কারণ হিসাবে বলেছেন:

'মহোদয় টড সাহেব নানা প্রকার বাধা, বিপত্তি ও স্বকীয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিয়ে স্থানে স্থানে অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অপিচ সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহার সম্যক অভিজ্ঞতা না থাকাতে পুরাণোক্ত চরিত্র ও ঘটনাবলীর সহিত তদ্বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনাবলীর স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণতা ও অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত অসদ্ভাব নিবারকরণ করিয়া ঐতিহাসিক অবিচ্ছিন্ন বৃত্তান্ত নিচয়ের সমন্বয় সাধনে তৎসমুদায়কে যথাস্থানে সন্নিবেশন ও পরিস্ফুটন না করাতে ইতিহাসের সৌন্দর্য অনেকাংশে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে।'

লেখক দেশীয় ও বিদেশীয় নানাবিধ গ্রন্থাদি সহযোগে প্রয়োজন-বোধে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত নিচয় সন্নিবিষ্ট করে 'সচিত্র রাজস্থান' প্রকাশ করেছেন লক্ষিত হয়।

'চারুবার্তা'র ভূতপূর্ব সম্পাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত এবং অঘোর নাথ বরাট কর্তৃক 'রাজস্থান' নামে টডের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১২৯০) বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় এক বছর পরে ১২৯১ বঙ্গাব্দে। প্রথম খণ্ডটিতে মেবারের বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মারবার, বিকানীর, কোটা, বুন্দি, অম্বর, যশল্মীর ও মরুভূমির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

যজ্ঞেশ্বরের অনুবাদটি যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ ১৯০৬ সালের মধ্যে গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণের প্রকাশ।

গ্রন্থটির মুখবন্ধে প্রকাশক (অঘোর নাথ বরাট) টডের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

'…ভারতের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকলের অধিগম্য হইয়াও হয় নাই ; ক্রমে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত ভারতের সম্বন্ধ বন্ধন হইতে লাগিল, ক্রমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের অতীত গৌরবের বিষয় অল্পে অল্পে জানিতে পারিয়া তাহার কীর্তি সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সে মন্থন হইতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক রত্ন ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই সকল রত্নের মধ্যে 'রাজস্থান' অন্যতম। ইহা ভারত রত্নাকরের একটা অমূল্য রত্ন বিশেষ।

…মহাত্মা কর্ণেল টড ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় হইয়াও যেরূপ কঠোর পরিশ্রম, অপরিসীম অধ্যবসায় মহৎ আত্মত্যাগ এবং অন্যান্য সাধারণী অনুসন্ধিৎসা সহকারে ভারতবর্ষীয় পতিত আর্য্যবীরগণের কীর্ত্তিকলাপ সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় সহসা বিমল কৃতজ্ঞতারসে অভিসিঞ্চিত হয় এবং স্বজাতি ও বিজাতি ভুলিয়া ভক্তিরূপ প্রসূনমালা লইয়া তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করিতে অগ্রসর হয়। যদি তিনি এই ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন কীর্তি উদ্ধৃত হইত কিনা, তাহা কে বলিতে পারে?'

প্রকাশক টডের অনুবাদের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন :

'মহাপুরুষ টডের পবিত্র নাম যে অধিকাংশ ভারত সন্তানের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহার কারণ তৎপ্রণীত মহামূল্য 'রাজস্থান' গ্রন্থের অনুবাদভাব। ভিন্ন ভাষায় নিবিড় আবরণে সমাচ্ছাদিত বলিয়া সে গ্রন্থ প্রায় সমস্ত ভারত সন্তানের অবিদিত। যদি রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় রাজস্থান গ্রন্থ ভারতীয় সকল ভাষাতেই

অনুবাদিত হইত, তাহা হইলে সকল ভারত সন্তানই আজ টড মহোদয়কে দেববাবে পূজা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, যাহাতে রাজস্থান সকল ভারত সন্তানেরই অধিগত হয়, তদ্বিষয়ে স্বদেশ হিতৈষী হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ চেষ্টা করা অতীব কর্তব্য।'

এইবার আমরা যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। আলোচ্য অনুবাদে টডের গ্রন্থের কোন প্রয়োজনীয় অংশই পরিত্যক্ত হয়নি। কেবলমাত্র টডের গ্রন্থের যে সকল অংশ বহু পরিচিত এবং যে সকল বৃত্তান্তের সন্নিবেশে অনুবাদ গ্রন্থের কলেবর অনর্থক বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা এবং অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক বলে অনুভূত হতে পারে, সেই সকল অংশই বাদ দেওয়া হয়েছে।

টডের গ্রন্থে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিচয় অনেক ক্ষেত্রেই নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তদুপরি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে পৌরাণিক ঘটনাসমূহ প্রকাশ করতে গিয়ে টড কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন। অনুবাদে লেখক সেই সকল ভ্রমের সংশোধন করেছেন এবং বিচ্ছিন্নাংশ যথাস্থানে সন্নিবেশ করেছেন।

এইবার যজ্ঞেশ্বর কৃত সেই সব সংশোধনের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা হল—

ক) টড আনর্তকে কুলস্থলির স্থাপনকর্তা এবং ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা বলে নির্দেশ করেছেন। বস্তুতঃ আনর্ত মহারাজ ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

(১ম খণ্ড ; পৃঃ ১২)

খ) টড লবকে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বলেছেন, কিন্তু কুশই জ্যেষ্ঠ।

(১ম খণ্ড ; পৃঃ ১৭)

গ) টড কার্তিকেয়কে সপ্তানন বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্তিকেয় ষড়ানন। (১ম খণ্ড ; পৃঃ ২৬)

ঘ) টড বলেছেন সবক্তগিঁর পিতার নাম আলেপ্তেগিঁ, কিন্তু দি গায়েন দি হারবিল্ট ও ব্রিগ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত মতাবলম্বন করে মহাত্মা এলফিন ষ্টোন প্রমাণ করেছেন যে বস্তুত সবক্তগিঁ সর্ববাদে৷ আলেপ্তগিঁর অধীন একজন ক্রীতদাস ছিলেন।

(১ম খণ্ড ; পৃঃ ১৩০)

ঙ) টড ভানু সপ্তমীকে সূর্যের জন্মদিবস বলেছেন। কিন্তু সূর্যের জন্ম অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে। (১ম খণ্ড ; পৃঃ ৬১৫)

চ) টডের মতে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, কিন্তু নাদির শাহ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতে প্রবেশ করেন। (১ম খণ্ড : পৃঃ ৪৪৬)

ছ) টড ফ্রোঙ্গানের লাত্রি খাঁকে পর্তুগীজ বীর ভাস্কোদাগামার দলভুক্ত কোন সৈনিক বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু যে সময়ে (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) বাহাদুর কর্তৃক চিতোর বিধ্বস্ত হয়েছিল, ভাস্কোদা-গামা তার বহু আগেই মারা যান। অতএব লাত্রি খাঁ ভাস্কোদাগামার পরবর্তী অন্য কোন পর্তুগীজ নাবিকের দলভুক্ত ছিলেন।

(১ম খণ্ড ; পৃঃ ২৩৩)

জ) টড মহাব্বৎ খাঁকে শিশোদীয় কুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ সাগরজির পুত্র বলে অভিহিত করে বলেছেন যে ইনি নাকি স্বধর্ম পরিত্যাগ করে মহাব্বৎ নাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আসলে ইনি ছিলেন কাবুলের অধিবাসী ঘোরবেগ নামক জনৈক মুসলমানের পুত্র।

(২য় খণ্ড ; পৃঃ ৬৬)

'সচিত্র রাজস্থান' 'বসুমতী' কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়, এটি মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি দ্বারা অনূদিত হয়েছিল এবং প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। শোভাবাজারের রাজবাটি থেকে 'রাজস্থানে'র দু'খানি বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয়েছিল। এই অনুবাদ কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন বরদাকান্ত মিত্র। কিন্তু গ্রন্থের মূল্যাধিক্য বশতঃ সেই গ্রন্থ সাধারণের হস্তগত হতে পারে নি। সেইজন্য বটে, তদুপরি টডের

গ্রন্থটিকে মনোরঞ্জক উপন্যাসরূপে সজ্জিত করে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতেই 'সচিত্র রাজস্থানে'র প্রকাশ।

সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটানোর জন্য টডের গ্রন্থে বর্ণিত অনেক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নিবন্ধের কেবলমাত্র সারাংশটুকু উদ্ধার করা হয়েছে। সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায় গ্রন্থটি রচিত বলে বলা হলেও বেশ গুরু গম্ভীর সাধু ভাষায় গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত।

গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে গ্রন্থটি চিত্র সম্বলিত। 'সচিত্র রাজস্থান' যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত 'রাজস্থান' গ্রন্থের পরে প্রকাশিত। যজ্ঞেশ্বরের 'রাজস্থান' প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে আর 'সচিত্র রাজস্থান' প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। কিন্তু ভাষার বিচারে যজ্ঞেশ্বরের রচনা আরও অনেক সহজ ও সরল। 'সচিত্র রাজস্থানে'র ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা। যজ্ঞেশ্বর অনেক বিস্তৃত পরিসরে অনুবাদ করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে টডের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির অনুবাদে তেমন কোন ত্রুটি নির্দেশ দেখা যায় না। মহেন্দ্রনাথের অনুবাদ তুলনামূলক বিচারে অনেক সংক্ষিপ্ত, তবে ঘন পিনদ্ধ। মহেন্দ্রনাথ যে যজ্ঞেশ্বরের অনুবাদ পড়েছিলেন, অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

ক.

সতীশচন্দ্র মিত্র : প্রতাপসিংহ, ১৯০৪

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী : চিতোরোদ্ধার, ১৩২৫

ঐ : হাম্মির, ১৩২২

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : রাণা কুম্ভ, ১৩২৯

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ : মিবার কুমারী, ১৩৩০

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ : পান্না, ১৩৩১

প্রফুল্লময়ী দেবী : ধাত্রীপান্না, ১৩৩৩

মৌলবী মোহাম্মদ আবুলমোনেম : মেবার মিলন, ১৯৩৩

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : আহেরিয়া, ১৩২১

ঐ : পদ্মিনী, ১৯০৬

নিস্তারণচন্দ্র চক্রবর্তী : মেবার গৌরব, ১৩১৮

রজনীকান্ত গুপ্ত : আর্য্য-কীর্ত্তি, ১৮৮২

ঐ : বীরমহিমা, ১২৯১

মনোমোহন রায় : ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (১ম খণ্ড), ১৮৮৫

মনোমোহন রায় : জাগরিতা বা মিবার কীর্ত্তি, ১৩১২

ঐ : সতীর মূল্য, ১৩১৯

বিজয়রত্ন মজুমদার : রাজস্থান, ১৯১৪

ঐ : বাপ্পাবীর, ১৩১৮

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ : মেবার কাহিনী, ১৯১৬

বরদাকান্ত মজুমদার : কর্ম্মদেবী, ১৯১০

সুধাকৃষ্ণ বাগচী : কুমার ভীমসিংহ, ১৩১৯

সতীনাথ চক্রবর্তী : সরোজ সুন্দরী, ১৩১৯

অজ্ঞাত : পদ্মিনী, ১৩০১

বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : মেবার গৌরব, ১৩৩৬

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত : রাজপুত কাহিনী, ১৩১০

হারাণচন্দ্র রক্ষিত : বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্য, ১৮৭৯

রমেশচন্দ্র দত্ত : রাজপুতজীবন-সন্ধ্যা, ১৮৭৮

ঐ : মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, ১২৮৩

ঐ	:	মাধবী কঙ্কণ, ১৮৭৭
দয়ালচন্দ্র ঘোষ	:	হাম্মির, ১৯১৫
দামোদর মুখোপাধ্যায়	:	প্রতাপসিংহ, ১৮৮৪
রোহিনীকুমার সেনগুপ্ত	:	চণ্ডবিক্রম, ১৮৯৩
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়	:	তারাবাই, ১২৮১
শরৎচন্দ্র দে	:	শিলাদিত্য, ১৩০৭
গিরিজামোহন নিয়োগী	:	মেবার মহিমা বা রাজপুত গরিমা, ১৩১৬
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	:	উদয়সিংহ, ১৯১২
জ্যোতীশচন্দ্র লাহিড়ী	:	চিতোরকুমার, ১৩১১
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	:	পদ্মিনী, ১৩২২
নিশিকান্ত বসুরায়	:	বাপ্পারাও, ১৩২১
নারায়ণচন্দ্র বসু	:	হাম্মির, ১৩২২
ধূর্জটি অধিকারী	:	রাণা সঙ্গ, ১৩২৩
প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	:	অরিসিংহ, ১৩২৩
মণীন্দ্রনাথ মজুমদার	:	রাণা সংগ্রামসিংহ, ১৩১৭
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	অশ্রুমতি, ১৮৭৯
ঐ	:	সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ, ১৮৭৫
মধুসূদন দত্ত	:	কৃষ্ণকুমারী, ১৮৬১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	:	তারাবাঈ, ১৯০৩
ঐ	:	দুর্গাদাস, ১৯০৬
ঐ	:	প্রতাপসিংহ, ১৯০৫
ঐ	:	মেবারপতন, ১৯০৮
স্বর্ণকুমারীদেবী	:	নবকাহিনী, ১৮৯২
ঐ	:	দীপনির্বাণ, ১৮৭৬
ঐ	:	মিবাররাজ, ১৮৮৭
ঐ	:	বিদ্রোহ, ১৮৯০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	রাজকাহিনী, ১৯০৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	:	রাজসিংহ, ১৮৭৭
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	:	পদ্মিনী উপাখ্যান, ১৮৫৮

ঐ : কর্ম্মদেবী, ১৮৬২

ঐ : শূরসুন্দরী, ১৮৬৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : আনন্দরাহা, ১২৮৮

ঐ : চণ্ড, ১২৯৭

ঐ : রাণা প্রতাপ, ১৩১২

রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় : রাজমঙ্গল, ১৯১২

বিপিনবিহারী নন্দী : সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান,

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : পদ্মিনী, ১৩৩২

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ : কীর্ত্তিমন্দির বা রাজপুত-বীরকীর্ত্তি, ১৮৮৯

হেমলতা দেবী : মিবার গৌরব কথা, ১৯১২

প্যারীশংকর দাশগুপ্ত : মহারাণা প্রতাপসিংহ, ১৩০৬

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজস্থান, ১২৯০

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি : সচিত্র রাজস্থান, ১৩০৫

খ.

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : নাট্যকার শ্রীমধুসূদন, ১৯৬৬

অর্পণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত : বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৭

ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো : রাজস্থান কাহিনী (২য় সংস্করণ), ১৩৭৫

ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড ; ৪র্থ সংস্করণ), ১৩৬৯

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ সংস্করণ), ১৩৬৯

ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (৫ম সংস্করণ), ১৩৮৩

ডঃ পশুপতি শাসমল : স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য (১ম সংস্করণ), ১৩৭৮

দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলাল (২য় সংস্করণ), ১৩৭১

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার, ১৯৫০

ডঃ সুশীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস (৫ম সংস্করণ),

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ),

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ), ১৯৬০

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

মহামহোপাধ্যায় গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা : রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় ও ৩য় খণ্ড

: প্রবাসী, ১৩৩৭

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত : আর্য্যদর্শন, ১২৮২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১৫, ৬৮, ৬৯, ৭১ সংখ্যক

বৈদ্যনাথ শীল : বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা (২য় সংস্করণ),

অন্নদাশংকর রায় : বাংলার রেনেসাঁস,

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ ১৩৬১

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : নাট্যকার মধুসূদন,

শক্তি ভট্টাচার্য : বাংলা ঐতিহাসিক নাটক

যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী) : বাংলার নবজাগরণের কথা, ১৯৫৮

ঐ : জাগৃতি ও জাতীয়তা, ১৩৬৬

ডঃ স্বপন বসু : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস,

মোহিতলাল মজুমদার : বাংলার নবযুগ, ১৮৭৯

কাজী আবদুল ওদুদ : বাংলার জাগরণ, ১৩৬৩

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব); ১৩৫৬

প্রমথনাথ বিশী : বাংলার লেখক (১ম খণ্ড), ১৩৫৭

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য (১ম সংস্করণ), ১৩৬১

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (২য় সংস্করণ), ১৩৮৭

গ.

Dr. Iswari Prasad : History of Medieval India, 3rd Edition, 1940

Dr. K. S. Lal : History of the Khalljis, 1957

Dr. R. P. Tripathi : Rise and Fall of the Mughal Empire, 3rd Edition,

Vincent A. Smith : Akber the great Mogul, 1926

J. N. Sarkar : History of Aurangzib, 3rd Revised Edition. 1925

James Tod : Annals and Antiquities of Rajasthan, 1894 ; 1898

Grunt Duff : History of the Mahratta, 1826

Quarterly Review Vol. XlVIII Oct—Dec. 1832.

My favourite authors ; Wednesday Review ; Trichinopoly , 1905.

Bengalee, 1901.

The Modern Review (January. 1908).

শব্দসূচী